NAME : SMT NIVEDITA CHATTERJEE (HOD)
DEPT : POLITICAL SCIENCE
CODE : PLSA- CC- 2- 3- TH + TU

MODULE II

No 7. JUDICIARY: Supreme Court and the High Courts' composition and functions (Short answers- 15 X 1 = 15 marks)

প্র: ১ : ভারতীয় সংবিধানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা কে ?
উ: সুপ্রিম কোর্ট |

প্র: ২: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়েস কত?
উ: ৬৫ বছর |

প্র: ৩: রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্ট কখন আইনি পরামর্শ দিতে পারে?
উ: যখন রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হয়|

প্র: ৪: যখন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়েই অনুপস্থিত থাকেন তখন কে শাসনভার গ্রহণ করেন?
উ: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি |

প্র: ৫: PIL or Public Interest Litigation - এর জনক কোন বিচারপতি?
উ: পি. এন. ভগবতী |

প্র: ৬: ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্টে কোন কোন ক্ষেত্রে আপীল করা যায়?
উ: দেওয়ানি, ফৌজদারি ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বিষয়ে আপীল করা যায়|

প্র: ৭: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে অপসারণ করতে পারে?
উ: পার্লিয়ামেন্টের দুই - তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি পাশ হলে রাষ্ট্রপতি তাকে অপসারিত করেন |

প্র: ৮: সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারকদের ভারতবর্ষে কে নিয়োগ করেন?
উ: রাষ্ট্রপতি |

প্র: ৯: বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক সংখ্যা কত?
উ: ৩১ জন , ২০০৯ সাল থেকে |

প্র: ১০: সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেতন কত?
উ: ১ লক্ষ per month.

প্র: ১১: ভারতবর্ষে হাই কোর্টের সংখ্যা কত?
উ: ২৪ |

প্র: ১২: হাই কোর্টের বিচারপতিকে কোন অপরাধে অপসারিত করা যায়?
উ: অসদাচরণ বা অসামর্থের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের অপসারিত করতে পারেন |

প্র: ১৩: হাই কোর্টের বিচারপতিদের কে নিয়োগ করেন?
উ: রাষ্ট্রপতি |

প্র: ১৪: সর্বাধিক কত বয়েস পর্যন্ত হাই কোর্টে একজন বিচারপতি আসীন থাকতে পারেন?
উ: ৬২ বছর পর্যন্ত |

প্র: ১৫: কোন ধারা (Art.) বলে সংবিধানের হাই কোর্ট Writ Jurisdiction জারি করতে পারে?
উ: Art. 226.

MARKS - 10 বিচার-বিভাগীয় সক্রিয়তা (PLSA-CC-2-3-TH + TU)
MODULE II

আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সরকারী স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনীতির দুবৃত্তায়ন, দুর্নীতির রাজীনীতিকরণ কোটি কোটি টাকার স্ট্যাশ, ব্যাপক দারিদ্র ও নিরক্ষরতা প্রকৃতির ফলে ভারতের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বোরো ধরনের চাপ তৈরী করেছে | এই জটিল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের যে ধরনের ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল তা তারা করতে পারছেন না | এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনগণের আর্থ সামাজিক ন্যায় বিচারকে সুনিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সেফটি ভাল্ব হিসেবে বিচার বিভাগ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে |

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা কি?

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার অর্থ হলো বিচার বিভাগের সক্রিয় ভূমিকা | সমাজের পরিবর্তিত চাহিদাগুলি মোকাবিলা করার জন্য বিচারপতি যখন আদালতের বিচারবিভাগীয় পূর্ণ বিবেচনার ক্ষমতাকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করে তখনি এই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় | বিচার বিভাগের এই সক্রিয়তাকে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় -
১) যখন আদালত আইনসভা প্রণীত কোনো আইন বা প্রশাসনিক কাজকর্মের বৈধতাকে সাংবিধানিক মূল্যবোধের মধ্য থেকে বিচার করে, তখন তাকে নেতিবাচক সক্রিয়তা বা আইনগত সক্রিয়তা বলে | কিন্তু আদালত যখন কোনো আইন বা প্রশাসনিক সিমান্তের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অনুবিধিগুলির ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে অতিক্রম করে যায় তখন তাকে ইতিবাচক সক্রিয়তা বলা যায় | আমাদের সংবিধান রচয়িতাগণ বিচার বিভাগকে এতটা ইতিবাচক সক্রিয়তার অধিকারী করে গড়ে তোলেননি | অবশ্য আমাদের সংবিধানের এমন কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার সুযোগ নিয়ে বিচার বিভাগ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে |

স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক-জরুরি অবস্থার সময় পর্যন্ত বিচার বিভাগ মোটামোটি বিচার বিভাগীয় সীমাবদ্ধতার নীতি অনুসরণ করেছে এবং একটা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছে | বিচার বিভাগের এই পর্যায়ের ভূমিকাকে ইতিবাচক সক্রিয়তা বলা যেতে পারে |

তবে জরুরি অবস্থা উত্তরকালে বিচারবিভাগ তার রক্ষণশীল ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে | কতগুলো বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করে সাংবিধানিক ব্যাখ্যাকে আরো ব্যাপক করার চেষ্টা করেছে | সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো উদার ব্যাখ্যা, নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা, নতুন কতগুলি ব্যবস্থা যেমন জনস্বার্থ মামলার অনুমতি, টেলিগ্রাম বা চিঠি দ্বারা অভিযোগ জানালে প্রতিকারের ব্যবস্থা, নতুন নতুন আইনগত সংস্থা যেমন লোক আদালত, পারিবারিক আদালত, ক্রেতা আদালত, গ্রীন বেঞ্চ মানবাধিকার কমিশন প্রবৃত্তি প্রবর্তনের ফলে বিচার বিভাগের ক্ষমতার পরিধি অনেকটা বেড়েছে | এটাও ঠিক যে এইসব পদ্ধতির সাহায্যে শিশু, নারী, বেগার শ্রমিক, বিচারাধীন বন্দি প্রবৃত্তি

দুর্বলতম অংশের কল্যাণার্থে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা নিতে পেরেছে | এছাড়া সাম্প্রতিক কালে হাওলা পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি, চিনি, ইউরিয়া কেলেঙ্কারি সহ বিভিন্ন দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার রায় দ্বারা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে | সারা দেশব্যাপী যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে উঠেছে তা অনেকটা আদালতের সক্রিয়তার ফলে |

তবে বিচারবিভাগের এই অতি সক্রিয়তা সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তা নয় | বিচার বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে নিজের সীমাকে অতিক্রম করে নিজেকে আইনের উর্ধে তুলে ধরার প্রবণতা দেখিয়েছে | প্রাক্তন বিচারপতি J. S. Verma সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন "Who will judge the judges?"

তাই সমস্ত দিকগুলির একটা বাস্তববাদী মূল্যায়ন হওয়া দরকার | বিচার বিভাগের সক্রিয়তা তাই একটা স্তর পর্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য | ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভয়ংকর সমস্যাগুলি বিচার বিভাগের একার পক্ষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ এবং সমাধান করা সম্ভব নয় |

NAME : SMT NIVEDITA CHATTERJEE (HOD)
DEPT : POLITICAL SCIENCE
CODE : PLSA- CC4- 10TH - TH + TU

MODULE I
(Short answers- 15 X 1 = 15 marks)

প্র: ১: প্রজাতন্ত্র (Republic) গ্রন্থটি কার লেখা?
উ: A. B. Plato.

প্র: ২: Politics - এ কারা নাগরিকতার বহির্ভূত ছিলেন?
উ: নারী ও শ্রমিকরা |

প্র: ৩: Aristotle - এর জন্মস্থান কোথায়?
উ: Stagira.

প্র: ৪: Aristotle দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?
উ: আলেক্সান্ডার দি গ্রেট |

প্র: ৫: Aristotle কার ভাব-শিষ্য ছিলেন?
উ: Plato.

প্র: ৬: Aristole - এর মতে মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে দণ্ডনির্ধারক |
উ: সত্যি |

প্র: ৭: পলিস কি?
উ: গ্রীস দেশের নগররাষ্ট্র |

প্র: ৮: গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় সুশাসনের দুটি দিক কি?
উ: স্বাধীনতা এবং আইনের অনুশাসন |

প্র: ৯: প্লেটোর ন্যায়নীতি তত্ত্বের মুল বক্তব্য কি?
উ: সামাজিক ভূমিকাভিত্তিক বিশেষীকরণ ও সামাজিক শ্রমবিভাজন |

প্র: ১০: 'The State is prior to individual"- কার বক্তব্য?
উ: Aristotle.

প্র: ১১: "Politics" গ্রন্থটি কার লেখা?
উ: Aristotle.

প্র: ১২: Aristotle - এর মতে ক'ধরনের শাসনব্যবস্থা ও তাদের নাম?

উ: শাসকদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে | যেমন একজন শাসকের দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র, কতিপয় মানুষদের নিয়ে তৈরী অভিজাততন্ত্র এবং সর্বশেষে অগণিত মানুষ নিয়ে তৈরী গণতন্ত্র |

প্র: ১৩: jus gentium ও jus naturale কি?

উ: এই দুটি রোমে প্রচলিত দুটি প্রাকৃতিক আইন |

প্র: ১৪: ইউরোপের মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

উ: ক্রীষ্টানধর্ম এবং কৃষ্টিও চার্চ ব্যবস্থার বিস্তার |

প্র: ১৫: "দুই" তরবারীর তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি?

উ: চার্চ ব্যবস্থার অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা |

২

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন : প্লেটো

ভূমিকা

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ অব্দ) গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিশ্বে ভাববাদী বা ইউটোপিয়ান দর্শনের জনক। তাঁর দর্শন বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটলের শিক্ষক। প্লেটো ছিলেন রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শনের সুসামঞ্জস্য রূপকার। তাঁর হাতেই রাষ্ট্রদর্শন সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং স্বার্থকভাবে চিত্রিত হয়। প্লেটোর মূল রচনা প্রায় পঁয়ত্রিশটি। এর মধ্যে *'দি রিপাবলিক' 'দি লজ' 'দি- ষ্ট্রেটসম্যান'* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্লেটো প্রকৃতিবাদী এবং বস্তু নির্ভর দর্শনকে অস্বীকার করেন ও ভাববাদী দর্শনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি বিশ্বাস করতেন, দৃশ্য জগতের বস্তু সত্য নয়। সৃষ্টির পেছনে আছে অ-বস্তু তথা ভাব। এই ভাবের মূলে আছে বিশ্ব আত্মা, যার সৃষ্টি বা লয় নাই। এ আত্মা অবিনশ্বর ও অতিন্দ্রিয়। জন্মসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন অভিজাত রক্ত। তাঁর শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে গণতন্ত্রের বিপরীত প্রান্তে নিয়ে যায়। সক্রেটিসের অমর বাণী 'সদগুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge) তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সক্রেটিসের ন্যায় তিনিও দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, জীবন একটি শিল্প (art), যা কেবল মাত্র জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশ পেতে পারে। এ শিল্পের পরিপূর্ণতা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এর সুষ্ঠুবাস্তবায়নের জন্য চাই প্রজ্ঞা।

প্রাচীন মূল্যবোধের অবক্ষয়, অভিজাত ও গণতন্ত্রীদের মধ্যে অবিরাম ক্ষমতার অদল বদলের ফলে সমাজ, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসে চরম অস্থিরতা। প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চরম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। এ অবক্ষয় প্লেটোকে ব্যাথিত করেছিল। এমতাবস্থায় প্রাচীন মূল্যবোধকে পুন:প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।তিনি ভেবেছিলেন শ্রম বিভক্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে দার্শনিক (জ্ঞানীর) শ্রেণীর দ্বারা দেশ শাসিত হলেই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর বিখ্যাত *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রসুত ন্যায়বিচার ভিত্তিক দার্শনিক রাজা শাসিত 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কল্পনা করেছিলেন। আর এ আদর্শ রাষ্ট্রের কর্মসূচী হিসেবে শিক্ষা এবং এক ধরনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার বর্ণনা করেছিলেন।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ : প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব;*
- *পাঠ-২ : প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র;*
- *পাঠ-৩ : প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা;*
- *পাঠ-৪: প্লেটোর সাম্যবাদ।*

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ প্লেটোর ন্যায় বিচার তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মমার্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

প্লেটোর সমগ্র দর্শন তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বিচার তত্ত্ব তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। এমনকি *'দি রিপাবলিক'* গ্রন্থের বিকল্প শিরোনাম হলো 'ন্যায়বিচার বিষয়ক গ্রন্থ' (Concerning Justice)। অধ্যাপক স্যাবাইন বলেন, ''দি রিপাবলিকের ন্যায়বিচার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্লেটোর রাষ্ট্রীয় মতবাদ চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েছে।"

শাসন একটি শিল্প ও গুণ। এই গুণ যাদের মধ্যে বিরাজমান কেবলমাত্র তারাই হবেন শাসক

প্লেটোর কাছে ন্যায়বিচার এর সাধারণ অর্থের মত তথা 'ঔচিত্য' বা 'অন-ঔচিত্যবোধক' নয়, বরং তা যোগ্যতা ও শ্রমবিভক্তির ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর সময় ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু এথেন্সের নগররাষ্ট্রে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, তিনি সে সংকটকে সাধারণভাবে 'ন্যায়ের সংকট' বলেই মনে করেছিলেন। ন্যায়ের সংকট বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, 'যার যে যোগ্যতা আছে, সে সেখানে না থেকে অন্যত্র অবস্থান করছে। অর্থাৎ যারা শাসন করছেন তারা শাসক হওয়ার উপযুক্ত নন। শাসন একটি শিল্প ও গুণ। এই গুণ যাদের মধ্যে বিরাজমান কেবলমাত্র তারাই হবেন শাসক। তবেই রাষ্ট্রের কাজকর্ম সুষ্ঠু ও ঐক্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। মানুষের জীবনে আসবে স্থায়ী শান্তি।

প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার হলো কর্মবিশেষীকরণের মাধ্যমে কর্মবন্টন করা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা এবং এ ভাবে পারস্পরিক সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা

উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্লেটো মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্লেটোর মতে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে তিন ধরনের উপাদান রয়েছে, যেমন (১) প্রজ্ঞা (wisdom), (২) সাহস (courage), ও (৩) প্রবৃত্তি (appetite)। ব্যক্তি জীবনের এই তিন ধরনের অবস্থার সমন্বয় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। যেমন, কারও মধ্যে প্রজ্ঞার মাত্রা অধিক, আবার কারও মধ্যে প্রবৃত্তির মাত্রা অধিক। আবার কারও মধ্যে সাহসের মাত্রা বেশী। এমতাবস্থায় ব্যক্তির জীবনের তিনটি অবস্থার হেরফের রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনটি শ্রেণী তৈরী করে যাকে, যথা (১) প্রজ্ঞা বিশিষ্টরা দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত (২) সাহসীরা যোদ্ধা শ্রেণী ও (৩) প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিতরা কৃষক বা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। ব্যক্তি জীবনে যখন বিক্রম ও প্রবৃত্তি প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের বেলাতেও অনুরূপভাবে দার্শনিক, যোদ্ধা ও উৎপাদক শ্রেণী যখন নিজ নিজ যোগ্যতা, প্রকৃতি ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজকর্ম করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার হলো কর্মবিশেষীকরণের মাধ্যমে কর্মবন্টন করা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা এবং এ ভাবে পারস্পরিক সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। তাই প্লেটোর ভাবধারা অনুযায়ী বলা যায়, 'ন্যায়বিচার হলো সমন্বয় সাধনকারী ও সম্প্রীতিপূর্ণ একটি বন্ধন যা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে।' তিনি মনে করেছিলেন, 'ন্যায়বিচার' ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে কোন প্রকার সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দিবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী ভিত্তিক ঐক্য। সংঘাত দূর করাই ছিল প্লেটোর লক্ষ্য। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তিনি নৈপুন্যের (skill) উপর জোর দিয়েছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পেলে এবং প্রত্যেকে নিষ্ঠার সাথে উক্ত কাজ সম্পন্ন করলে দক্ষতা অর্জিত হবে এবং সমাজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে না। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বকে

প্রত্যক্ষ করার জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা অংকন করেছিলেন, যেখানে তাঁর মতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই অর্থাৎ দার্শনিক শ্রেণী হবেন কেবল মাত্র শাসক।

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের সমালোচনা

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যথা:

- এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে তা প্রকারান্তরে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে বলে প্লেটোর ছাত্র এবং প্রায় সমসাময়িক, এরিষ্টটল মন্তব্য করেছেন।

- সর্বাত্মকবাদী দর্শন হিসেবে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিখ্যাত লেখক কার্ল পপার এ জন্য প্লেটোকে 'সর্বাত্মকবাদী ধারণার জনক' বলে আখ্যায়িত করতে চান। কারণ, প্লেটো তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করতে চেয়েছেন।

- প্লেটো তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মাধ্যমে মূলত: একটি মাত্র শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন- শ্রেণীটি হলো অভিভাবক শ্রেণী। কারণ, তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বানুযায়ী অভিভাবক শ্রেণী (দার্শনিক)ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর শাসন করার যোগ্যতা ও অধিকার নাই। এভাবে প্লেটো শ্রেণী আধিপত্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

- প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি পাকাপোক্ত ধারণা। তা'ছাড়া এটি মানবাধিকার বিরোধীও বটে। তিনি তার দর্শনে অভিভাবক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত পরিবার ও সম্পত্তি নিষিদ্ধ করে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি আঘাত হেনেছেন।

- প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বে এক ধরনের জগদ্দল এবং অনড় শ্রেণী বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং সে সাথে এ তত্ত্বে পরিবর্তন ও উন্নয়নকে অস্বীকার করা হয়েছে। শ্রেণী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ রহিত করে তিনি রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বেনজামিন ফেরিংটন প্লেটোকে তাই একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাবিদ' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান।

- আধুনিক ধারণার সাথে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, আধুনিক কালে শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রাধান্যকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক দৃষ্টিভংগি হলো সমতামূখী। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নির্বিশেষে সকলেই সমান। তবে বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে এ ধরনের সমালোচনাকে প্লেটোর প্রতি অবিচার বলে অনেকে মনে করেন।

সারকথা:

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব কর্মবিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার যে যোগ্যতা আছে সে শুধু সেই কাজ করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই শাসক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শাসক হলে রাষ্ট্রে আর কোন সমস্যা থাকবে না। সুতরাং রাষ্ট্রে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের শাসক, সাহসীদের সৈনিক ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের উৎপাদক শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত সুনিশ্চিত করাই হলো ন্যায়বিচার। সমালোচকেরা মনে করেন, তাঁর এই তত্ত্বের দ্বারা এক প্রকার সর্বাত্মকবাদের প্রকাশ ঘটেছে। তা'ছাড়া এর ফলে অনড় শ্রেণী-প্রাধান্য বজায় থাকবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ব্যাহত হবে।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব নিম্নের কোন্ ধারণাটির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) সমতার নীতি; (খ) ঔচিত্য ও অনঔচিত্য;

(গ) রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি; (ঘ) শ্রম বিভক্তি ও কর্মবিশেষীকরণ।

সঠিক উত্তর - ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। প্লেটো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

২। এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

৩। প্লেটো কোন ধরনের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

৪। প্লেটো সক্রেটিসের কোন ধারণাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন?

৫। কোন ধরনের শাসকগোষ্ঠী সক্রেটিসকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল?

৬। গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কিরূপ ছিল?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সমালোচনাসহ প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২। প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার কি? কেন তিনি এ ধরনের তত্ত্ব গঠনে উৎসাহী হয়েছিলেন?

পাঠ-২

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ❑ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজার অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক নগর রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনাই ছিল প্লেটোর দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাত ন্যায়কে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। বলাবাহুল্য, এ আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্লেটো মূলত: কোন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নেন নি। তাঁর এ আদর্শ রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত। তাই এটিকে অবাস্তব (utopia) বা কাল্পনিক রাষ্ট্র বলা যায়। বাস্তবে 'কেমন হয়' তা না ভেবে সংকট মুক্তি ও শান্তির জন্য 'কেমন হওয়া উচিত' তাই ছিল তাঁর মূল জিজ্ঞাসা। এ প্রসঙ্গে স্যাবাইনের মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য। স্যাবাইন বলেন," নীতিগতভাবে রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত প্লেটো সেটিই দেখাতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা যদি নীতিভিত্তিক না হয় তবে তা বাস্তব অবস্থার ত্রুটি।"

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ছিল কাল্পনিক

ন্যায়বিচার তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে প্লেটো দেখিয়েছেন যে, মানব ব্যক্তিত্বের তিনটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো যুক্তি, সাহস ও কামনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদীতা, সাহস ও কামনা-বাসনা পরিদৃষ্ট হয়। তবে সকলেই একভাবে পরিচালিত হন না। কেউ যুক্তির দ্বারা, কেউ সাহসের দ্বারা, আবার কেউ কামনার দ্বারা চালিত হন। এ ভাবে রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণীর প্রকাশ ঘটে। যারা কামনার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা রাষ্ট্রের কৃষি, হস্তশিল্প তথা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনী সাহসের দ্বারা চালিত শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী হবেন ধৈর্য, মেধা বা প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত গোষ্ঠী। এ শাসক শ্রেণীকে প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রে 'অভিভাবক শ্রেণী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা আবার দার্শনিক। তাই দেখা যায়, প্লেটোর কাল্পনিক রাষ্ট্রে অভিভাবক শ্রেণী বা দার্শনিক রাজাদের কাজ দেশ শাসন করা। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সাহসের দ্বারা চালিত সেনাবাহিনীর উপর। আর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক ও জনসাধারণের বস্তুগত চাহিদা পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে উৎপাদক শ্রেণীর উপর।

মানুষের মধ্যে যুক্তি, সাহস ও কামনা এই তিন ধরনের উপাদান থাকে

দেখা যায়, প্লেটো মানবআত্মা এবং ব্যক্তিত্বের উৎসগুলোকে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে এক অভিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। প্লেটো মনে করতেন, মানুষ সকলে সমান নয়। সৃষ্টির মধ্যেই এ অসমতার বীজ নিহিত থাকে। বিধাতা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন গুণ দ্বারা তৈরী করেছেন। কেউ সোনা দ্বারা তৈরী, কেউ রূপা দ্বারা তৈরী, কেউ আবার তামার তৈরী। তাঁর মতে সোনা দ্বারা তৈরী নাগরিকেরা শাসন করার গুণ সম্পন্ন। রূপার তৈরী নাগরিকেরা যোদ্ধা বা সৈনিক সুলভ গুণে গুণান্বিত। আর তামার তৈরী নাগরিকেরা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণভুক্ত যারা উৎপাদন কাজের জন্য উপযুক্ত। এ ভাবে তিনি কর্মবিশেষীকরণ ও শ্রম বিভক্তির নীতির অবতারণা করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে উপরোক্ত নীতির প্রতিফলন ঘটবে। যোগ্য লোকেরা যোগ্য স্থান পাবেন। রাষ্ট্র সংঘাতের হাত থেকে রেহাই পাবে। স্থায়ী ভাবে শান্তি ও উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন ভার থাকবে দার্শনিক রাজাদের উপর। এদের প্রধান গুণ হল প্রজ্ঞা। ক্ষমতার প্রতি তাঁরা মোহান্বিত হবেন না। পক্ষপাতিত্ব তাদের কাছে অজানা থাকবে । প্রজ্ঞা ও যুক্তিই হবে

কর্মবিশেষীকরণ ও শ্রমবিভক্তির অবতাণা

তাদের মূল চালিকা শক্তি। এমতাবস্থায় দার্শনিক রাজারা স্ববিবেচনায় শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। তাদের পেছনে কোন প্রকার আইনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। কারণ, প্লেটো মনে করতেন, শাসক যদি আইন না মেনে চলেন তবে আইন থাকা অর্থহীন, আবার শাসক যদি নীতিহীন কিছু না করেন, তবে আইন থাকা অপ্রয়োজনীয়।

প্লেটো তারপরও অতি সাবধানীর মত দার্শনিক রাজা ও সৈনিক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তাদের কোন প্রকার ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না । তাঁরা ব্যারাকে থাকবেন এবং একত্রে খাবেন। তাদের যৌন মিলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। কোন নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী নয়, বরং সাময়িকভাবে মেয়ে এবং পুরুষ মিলিত হবেন। ফলে মিলনের কারণে যে সন্তান জন্ম নিবে সে সন্তান চিহ্নিত করা যাবেনা। প্লেটো ভেবেছিলেন এমতাবস্থায় শাসক শ্রেণী সম্পূর্ন স্বার্থহীনভাবে দেশের জন্য কাজ করবেন। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সুযোগ থাকবে না।

আদর্শ রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কে কোন শ্রেণীভুক্ত হবেন তা স্থির করার জন্য প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে গুণ সম্পন্ন করে তুলবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্তর ভিত্তিক। প্রথম স্তরের অকৃতকার্যরা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত হবেন। দ্বিতীয় স্তরের অকৃতকার্যরা হবেন সৈনিক শ্রেণীভুক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরে যারা সাফল্য লাভ করবেন তারা হবেন দার্শনিক শাসক। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে নারী পরুষের ভেদাভেদ নাই। সুতরাং প্লোটোর আদর্শ রাষ্ট্র একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রচিন্তার ফসল।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সমালোচনাঃ

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

- **বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীনঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবের সাথে সমপূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। তাঁর এ ধরনের কল্পিত রাষ্ট্র বাস্তবে কোন দিনই ছিল না এবং বলা বাহুল্য, বাস্তবে এরূপ রাষ্ট্রের রূপদান করাও সম্ভব নয়। এ ধরনের ইউটোপিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কি কি সমস্যা আসতে পারে সে বিষয়ে প্লেটো ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের অবাস্তবতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তারপরও তিনি ভেবেছিলেন বাস্তবে যে রাষ্ট্র তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের যতবেশী নিকটবর্তী হবে সে রাষ্ট্র ততবেশী মঙ্গলময় হবে।

- **শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্রঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র একটি শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্র। অধ্যাপক স্যাবাইন মনে করতেন যে, প্লেটোর শ্রেণী ভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র বর্ণপ্রথার মত নয়। কিন্তু তবুও এ ধরনের সংগঠন শ্রেণী বিভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সার্বজনিনতার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। জেলার নামক একজন লেখকের মতে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র মূলত: অভিজাততান্ত্রিক। এ আভিজাত্য বুদ্ধি ও মেধার অভিজাত্য। উপরন্তু তিনি উৎপাদক শ্রেণীর আত্মিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি ঔদাসিন্য দেখিয়েছেন। ঐক্যের নামে তিনি বরং শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ বপন করেছেন।

- **আইনের প্রতি অবজ্ঞাঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের 'দার্শনিক শাসক' আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে স্ববিবেচনায় শাসন করবেন-এমন নীতি প্রকারান্তরে আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ। এতে স্বৈরশাসনের পথ সুগম হতে পারে। পরবর্তীতে স্বয়ং এরিষ্টটল বলেছেন, ব্যক্তির শাসনের চেয়ে আইনের শাসন সব সময়ই উত্তম।

এরিষ্টটল বলেছেন, ব্যক্তির শাসনের চেয়ে আইনের শাসন সব সময়ই উত্তম

- **অহেতুক ঐক্যের উপর জোরঃ** সমাজের উন্নতির জন্য ঐক্যের প্রয়োজন থাকলেও বৈচিত্রবিহীন ঐক্য অনৈক্যের সামিল। সমালোচকরা মনে করেন প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে তথাকথিত ঐক্যের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ এর বড় একটি দুর্বলতা। এরিষ্টটল এ

সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'ঐক্যের উপর অহেতুক গুরুত্ব দিলে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বলতে কিছু হয়ত থাকবে না।'

- **সাম্যবাদী ধারণা অহেতুক ও উদ্ভটঃ** প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রে যে ধরনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা মানব প্রকৃতি বিরোধী এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। অভিভাবক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে তিনি তাদেরকে 'যন্ত্র' বানাতে চেয়েছেন। তাঁদের স্বাভাবিক আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে রুদ্ধ করতে চেয়েছেন। উপরোক্ত সমালোচনার পরও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রদর্শনে একটি বড় মাপের অবদান। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সুসামঞ্জস্য ও সামগ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

সারকথা:

প্লেটো তার ন্যায়বিচার তত্ত্বের আলোকে রাষ্ট্রের ঐক্য ও মঙ্গলের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। বিভিন্ন মানুষের গুণাগুণ নির্ভর তিনটি শ্রেণী এতে থাকবে। বুদ্ধি এবং মেধা সম্পন্ন মানুষ হবেন শাসক বা দার্শনিক রাজা। সাহসী চরিত্রের মানুষ হবেন সৈনিক এবং আবেগ দ্বারা তাড়িত মানুষ হবেন উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। দার্শনিক শাসকেরা আইনের গন্ডির বাইরে থেকে স্ববিবেচনায় দেশ শাসন করবেন। তাঁদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার থাকতে পারবে না। প্লেটো মনে করতেন এমতাবস্থায় তাঁরা সার্বিক ও নিস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করতে পারবেন। প্লেটোর এই আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবতা বিবর্জিত।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের কি গুণের অধিকারী হতে হবে?

(ক) সাহস; (খ) সংগীত;

(গ) প্রজ্ঞা ও সাহস; (ঘ) আবেগ।

সঠিক উত্তর : গ.

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। আদর্শ রাষ্ট্রে কয়টি শ্রেণী থাকবে ?

২। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি কোথাও বাস্তবায়িত হয়েছিল?

৩। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের কি গুণাবলী থাকা আবশ্যক?

৪। কেন প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার প্রথা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন?

৫। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি শ্রেণীহীন প্রতিষ্ঠান?

রচনামূল প্রশ্নঃ

১। সমালোচনাসহ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিন।

২। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি? আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ❑ একটি রাষ্ট্রে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

রাষ্ট্র মূলত: একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

প্লেটোর শিক্ষা তত্ত্ব তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা ও সাম্যবাদকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। *রিপাবলিক* এর মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা অবলোকন করে অনেকে *'রিপাবলিক'* কে মূলত: শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনার পুস্তক বলে মনে করতে চান। ফরাসী দার্শনিক রুশোর মতে 'প্লেটোর *রিপাবলিক* কোন রাজনৈতিক গ্রন্থ নয়, বরং শিক্ষা সম্পর্কে এ যাবৎ যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।' প্লেটো খুব সঙ্গত কারণেই শিক্ষার উপর এতো গুরুত্বারোপ করেছিলেন। প্লেটো শিক্ষাকে তৎকালীন প্রচলিত ধারণা তথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষাকে তিনি সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেও মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ ঘটায়, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সত্যকে বেছে নেয় এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়ায়। তিনি আরও মনে করতেন, রাষ্ট্র প্রধানত: একটি শিক্ষামূলক সংগঠন। শিক্ষার সাহায্যেই জনগণের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠন করা যায়। শিক্ষা ব্যতীত একটি সুসামঞ্জস্য রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। প্লেটোর এ বিশ্বাসের মূলে ছিল সম্ভবত: সক্রেটিসের সেই অমর বানী,"সদগুণই জ্ঞান।" প্লেটো বিশ্বাস করতেন শিক্ষার মাধ্যমে এ সদগুণ অর্জন করা যায়। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্কার মন্তব্য করেছেন, 'প্লেটোর কাছে শিক্ষা মানসিক ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে মানসিক রোগ আরোগ্য করার এক প্রচেষ্টা বিশেষ।' তদুপরী তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে শ্রেণী বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

প্লেটোই সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ব্যবধান না থাকার কথা বলেছেন

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনার রেখে প্লেটো প্রথমত: সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন এথেন্সের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে এসেছেন। তখন সেখানে না ছিল সার্বজনীন শিক্ষা না ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা। প্লেটো ভাবতেন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। এক্ষেত্রে সম্ভবত: তিনি স্পার্টার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোই সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ব্যবধান না থাকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রে ভূমিকা রাখার বেলায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাই শিক্ষা হবে উভয়ের জন্য উন্মুক্ত ও অভিন্ন। বলাবাহুল্য, প্লেটোর এ বক্তব্য ছিল তৎকালীন সমাজের জন্য অভিনব ও বৈপ্লবিক।

প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনা: স্তর বিন্যাস

শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্লেটো প্রধানত: দুভাগে ভাগ করেছেন, যথা:
(ক) প্রাথমিক শিক্ষা ও (খ) উচ্চতর শিক্ষা।

বয়স ভেদে এই স্তর দু'টিতে শিক্ষনীয় বিষয়গুলোও ভিন্নতর।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার সীমা হবে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এ স্তর হবে বাধ্যতামূলক। শৈশব থেকে এ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে এবং ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত

শিক্ষার্থীদেরকে কোন গুরুতর জ্ঞান দান করা হবে না, শুধু তাদের মানসিক বিকাশের সহায়ক উপকরণ দেওয়া হবে। নৈতিকতা, উত্তম আচার আচরণ ইত্যাদির সাথে সাহিত্য, সঙ্গীত ও সহজ গণিত শিক্ষাদান করা হবে। বলিষ্ঠ মন-মানসিকতা গঠনে সংগীত খুবই কার্যকর বলে তিনি মনে করতেন। সঙ্গীত শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হতো না। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য এ সব কিছুই ছিল সঙ্গীতের অর্ন্তভুক্ত। তবে প্লেটো অবাধ সঙ্গীত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এক ধরনের 'সেন্সরসীপ' এর কথা বলেছেন। যে সব কাব্যাংশে দেবতাদের তুচ্ছ করা হয়েছে সে সব কাব্য পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে। উপরন্তু আবেগ, উল্লাস ও অসংযত মাত্রার সাহিত্য ও সংগীত যা শিক্ষার মননকে কলুষিত করতে পারে, তাও বাদ দেওয়ার কথা প্লেটো অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন।

প্রাথমিক স্তর হবে বাধ্যতামূলক। সাহিত্য, সংগীত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে

শিক্ষার্থীদের ১৮ বৎসর থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত–অর্থাৎ দুই বৎসর শরীরচর্চা (Gymnastics) ও সামরিক কৌশল শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে প্লেটো ছিলেন নিশ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি লগ্নে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কৃতকার্যরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন, আর যারা ব্যর্থ হবেন, তারা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবেন। সুতরাং প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত।

(খ) উচ্চতর শিক্ষা: উচ্চ শিক্ষা আবার তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা:
(১) ২০ বৎসর বয়স থেকে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(২) ৩০ বৎসর বয়স থেকে ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(৩) ৩৫ বৎসর বয়স থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

উচ্চ শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে পাঠ্য বিষয় হবে উচ্চতর গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সঙ্গীত। এই স্তরে বিষয়গুলো যত্ন সহকারে অনুশীলিত হবে।

উচ্চশিক্ষার দ্বিতীয় স্তরের মূল পাঠ্য বিষয় হবে উচ্চতর দর্শন। এ পর্যায়ে দর্শন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ উত্তম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন এবং সে সাথে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যকার ঐক্যসূত্র উপলব্ধি করতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার চূড়ান্ত বা তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার সংগে জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন করা হবে। সে অর্থে দ্বিতীয় পর্যায়েই শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যায়ের বাছাই প্রক্রিয়ায় যারা বাদ পড়বেন তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্ব পাবেন। যারা কৃতকার্য হবেন তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া চলবে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এ সময় তারা বাস্তব জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবেন। শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাঁরা টিকে যাবেন তাঁরা সর্বোত্তম বলে গণ্য হবেন এবং তাঁরা উত্তম জ্ঞান লাভ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। আর এ উত্তম জ্ঞানই হলো শাসক তথা 'দার্শনিক রাজা' হওয়ার চূড়ান্ত ও একমাত্র যোগ্যতা। এদের হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পিত হবে।

উচ্চতর গাণিত এবং উচ্চতর দর্শন উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমভুক্ত হবে।

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে:-

- স্যাবাইন, ওয়েপার প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন প্লেটো তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের শ্রেণী পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল দার্শনিক শাসক তৈরী করা। রাষ্ট্রের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার যদি কোন পরিকল্পনা তাঁর থাকতো তবে, উৎপাদক শ্রেণী-তথা কৃষক, ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পীদের জন্য পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হতো। বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ার জন্য প্লেটো সমালোচিত হয়েছেন।
- অনেক সমালোচক প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনাকে সর্বাত্মকবাদী (Totalitarian) বলতে চান। তাঁরা বলতে চান, প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনায় স্বতস্ফুর্ততার অভাব আছে। উদ্দেশ্যবাদী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত জ্ঞান চর্চার উপর বাঁধা স্বরূপ। শিক্ষা পরিকল্পনার

মাধ্যমে প্লেটো মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। এটি সর্বাত্মকবাদের নামান্তর।

- নারী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে বলার জন্য রক্ষণশীলরা প্লেটোকে সমালোচনা করতে চান।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন, বাধ্যতামূলক ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, পাঠ্যক্রমের মধ্যে বাস্তব শিক্ষার সুযোগ দান ইত্যাদির জন্য এবং সর্বোপরি নারী শিক্ষার স্বীকৃতির জন্য প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনা আজও সমাদৃত।

সারকথা:

রাষ্ট্রের জন্য উৎকৃষ্ট শাসক ও দায়িত্বশীল নাগরিক এবং উপাদক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার অবতারনা করেছিলেন। তিনি তার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণযুক্ত ও নারী শিক্ষায় সমান সুযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার এ পরিকল্পনার জন্য অনেকে 'দি রিপাবলিক'কে একটি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ বলতে চান। সমালোচকেরা তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে শ্রেণীপক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং সর্বাত্মকবাদী বলে অভিহিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর সময়ে এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কোনটি ছিল?
(ক) নারী শিক্ষার স্বীকৃতি;
(খ) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক;
(গ) শিক্ষা ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত;
(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে শুধু পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণ করার রীতি ছিল।

২। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ এবং শেষ স্তরের সময়কাল (বয়স ভিত্তিক) ছিল:-
(ক) ৪০ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর;
(খ) ৪৫ বৎসর থেকে ৫৫ বৎসর;
(গ) ৩০ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর;
(ঘ) ৩৫ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর।
সঠিক উত্তর ১। ঘ ২। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:

১। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক রুশের মন্তব্য কি ছিল?
২। প্লেটো শিক্ষাকে কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন?
৩। প্লেটোর মতে ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষা কোন স্তরে অনুশীলীত হবে?
৪। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল কি?
৫। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কি?
৬। কেন এবং কোন পর্যায়ে প্লেটো পাঠ্যবিষয়ে সেন্সরশীপের প্রস্তাব করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনার বর্ণনা দিন। বর্তমান কালে তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা কি প্রয়োগযোগ্য?
২। সমালোচনাসহ প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪

প্লেটোর সাম্যবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সাম্যবাদ পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ❑ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সাম্যবাদ পরিকল্পনার সাথে বর্তমান যুগের সাম্যবাদ ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবেন।

শিক্ষা ও সাম্যবাদ পরস্পর বিরোধাত্মক

প্লেটো তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে প্রস্তাবিত আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় অভিভাবক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে শাসক ও যোদ্ধা শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ছিল বাধ্যতামূলক। উৎপাদক শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা তিনি বলেন নি। প্লেটো তাঁর সাম্যবাদী পকিল্পনার দ্বারা রাজনীতির উপর অর্থনীতির প্রভাবের চিরাচরিত সত্যটি উচ্চারণ করেছেন। তিনি তাঁর *দি রিপাবলিক* পুস্তকে বর্ণিত ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাম্যবাদের যে প্রস্তাব করেছেন তা প্রকারান্তরে পরস্পর বিরোধী।

প্লেটো প্রস্তাবিত শিক্ষা ও সাম্যবাদ পুরস্পর বিরোধী। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা যদি উপযুক্ত ও পুরোপুরি দার্শনিক রাজা সৃষ্টি করা যেতো, তাহলে হয়তো সাম্যবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম জ্ঞানী শাসক নির্বাচন করার পরও প্লেটো স্বস্তি পান নি। তাই তিনি অভিভাবক শ্রেণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধা নিষেধ আরোপের পরিকল্পনা করেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে সাম্যবাদের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। সুতরাং এ কথা নি:সঙ্কোচে বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইতিবাচক হয় (Positive) তাহলে সাম্যবাদ ছিল একটি নেতিবাচক (Negative) পরিকল্পনা। তবে এভাবেও বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা অর্জিত গুণাবলীকে সুনিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলনের জন্য তিনি অতিসাবধানী পদক্ষেপ হিসেবে সাম্যবাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

'দি রিপাবলিক' পুস্তকে প্রস্তাবিত অভিভাবক শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য সম্যবাদের দু'টো দিক লক্ষ্য করা যায়। (ক) সম্পত্তিগত ও (খ) পরিবারগত।

(ক) সম্পত্তিগত সাম্যবাদ: এর অর্থ হলো অভিভাবক শ্রেণীর কোন প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারবে না। এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত বাড়ীঘর পর্যন্ত থাকা চলবে না। তাঁরা একত্রে ব্যারাকে বসবাস করবেন, এবং সবাই মিলে একই টেবিলে একই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রই তাঁদের থাকা ও খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। তাদের জন্য পারিশ্রমিক এভাবে ব্যয় হবে। তাঁরা হাতে ব্যক্তিগতভাবে খরচ করার জন্য কোন প্রকার টাকা পয়সা পাবেন না। অর্থাৎ তাঁদের জীবন যাপন হবে সাম্যবাদী।

প্লেটো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে শাসক শ্রেণী ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রাপ্তির স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও অর্থ নিজেদের কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। এর ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যহত হয়। শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ দেখা দেয়। ঐক্য বিনষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য দারুনভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে শাসক শ্রেণীর যুক্তিবোধ লোপ পায় এবং আবেগ বা ক্ষুধা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অতত্রব শাসক বা অভিভাবক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দুষ্ট শিকড়ের মূল উৎপাটন করতে হবে। শাসক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি

থাকার বিধান রহিত হলে তাঁরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখবেন। ঐক্য সুষ্ঠভাবে বজায় থাকবে। রাষ্ট্র অভীষ্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীর জন্য সম্পত্তির সাম্যবাদের প্রস্তাব রেখেছেন।

অভিভাবক শ্রেণীর কোন ব্যক্তিগত পরিবার থাকবে না। স্ত্রীলোক এবং সন্তান তাঁদের সকলের বলে গণ্য হবে

(খ) পরিবারগত সাম্যবাদঃ প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে পরিবারগত সাম্যবাদ। এর অর্থ হচ্ছে অভিভাবক শ্রেণীর জন্য প্রচলিত পরিবার প্রথার উচ্ছেদ। অর্থাৎ অভিভাবকদের কোন প্রকার ব্যক্তিগত পরিবার পরিজন থাকতে পারবে না। নির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের সাথে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না। কার্যত: তাঁদের নির্দিষ্ট কোন সন্তান সন্ততি থাকবে না। অভিভাবকগণ ব্যারাকে বসবাস করবেন এবং সকলের একত্রে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। যৌন ক্ষুধা নিবারনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের সংগে তাঁরা মিলিত হতে পারবেন। তাঁদের মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হলে, তাঁরা সে সব সন্তানকে নিজের বলে চিহ্নিত করতে পারবেন না। ফলে অভিবাবক শ্রেণীর জন্য, স্ত্রীলোক যেমন সকলের জন্য তেমনি সন্তানও সকল অভিভাবকের বলেই গণ্য হবে। রাষ্ট্র ঐ সকল সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব নেবে। প্লেটো ভেবেছিলেন ব্যক্তিগত পরিবার এবং সন্তান-সন্ততি শাসককে স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট করে তোলে। ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ শাসন কায়েম করা সম্ভব হয় না। তাই পরিবার প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে তিনি তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীকে নিরপেক্ষ ও দক্ষ করতে চেয়েছেন। কারণ এমতাবস্থায় 'আমার' 'তার' বা 'আমার নয়' এমন চিন্তার আর সুযোগ থাকবে না। বরং তাঁরা সব কিছুই আমাদের 'সকলের' এমনভাবে ভাবতে শিখবেন। ফলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও উদ্দেশ্য সুদৃঢ় হবে।

প্লেটোর সাম্যবাদের সমালোচনা এবং আধুনিক সাম্যবাদের সাথে এর তুলনা

প্লেটো তাঁর *'রিপাবলিক'* পুস্তকে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপায়নের যথার্থ মাধ্যম হিসাবে অভিবাবক শ্রেণীর জন্য এক বিশেষ ধরনের সাম্যবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন। আধুনিক সাম্যবাদের দৃষ্টিতে তাঁর কল্পিত এ সাম্যবাদ যথার্থ নয়। প্লেটোর সাম্যবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচিত হয়েছে। যথা:

- প্লেটোর সাম্যবাদ ছিল শ্রেণী ভিত্তিক। রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে শুধুমাত্র অভিভাবক শ্রেণীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদ হলো শ্রেণীহীন, অর্থাৎ সকলের জন্য।

- আধুনিক সাম্যবাদ শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত, কিন্তু প্লেটোর সাম্যবাদ শ্রমজীবী মানুষের শোষণ সম্পর্কে নীরব বরং তা রাষ্ট্রের সু-শাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত। অর্থাৎ প্লেটোর সাম্যবাদ অর্থনৈতিক নয়, বরং রাজনৈতিক।

- প্লেটো তাঁর সাম্যবাদী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরিষ্টটল মনে করতেন প্লেটোর সাম্যবাদ বরং রাষ্ট্রের ঐক্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

- প্লেটোর সাম্যবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিরুদ্ধ। প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত ও প্রাকৃতিক আধিকার থাকা উচিত। অভিভাবক শ্রেণীর জন্য সম্পত্তি ও পরিবার প্রথার বিলুপ্তির প্রস্তাব করে প্লেটো তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন।

- এরিষ্টটল মনে করেছেন যৌথ মালিকানায় শিশুরা স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বেড়ে উঠবে, ফলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়ে তারা রাষ্ট্রের জন্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

- প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার সমালোচনা করতে গিয়ে এরিষ্টটল বলেছেন ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন। সম্পত্তিহীন মানুষ মূল্যহীন মানুষের সামিল।

- এরিষ্টটল আরও মনে করেছেন যে, যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং এতে উৎপাদন ব্যহত হয়। এতে কেউই মনোযোগ দেন না, ফলে রাষ্ট্র ও সম্পদ এ সব কিছুই দারুন অবহেলার লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। বলা বাহুল্য, যৌথ মালিকানার লক্ষ্যে পরিচালিত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সারকথা:

প্লেটোর তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের অভিভাবক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। যেখানে অভিভাবক শ্রেণীর কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার পরিজন থাকতে পারবে না। তাঁরা রাষ্ট্রের খরচে ব্যারাকে থাকবেন, এবং একই সাথে খাদ্য গ্রহণ করবেন। শাসকদেরকে স্বার্থ ও পক্ষপাতহীন তথা সু-শাসক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই তিনি এ পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তবে নানা দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর এ পরিকল্পনা সামালোচিত হয়েছে।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর সাম্যবাদ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের কোন্ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য ছিল?
(ক) সকল শ্রেণীর জন্য;
(খ) নারী ও শিশু শ্রেণীর জন্য;
(গ) উৎপাদক শ্রেণীর জন্য;
(ঘ) অভিভাবক শ্রেণীর জন্য।

২। প্লেটোর সাম্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল–
(ক) শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা;
(খ) রাষ্ট্রের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা;
(গ) রাষ্ট্রের সুষ্ঠু শাসন ও ঐক্য নিশ্চিত করা;
(ঘ) নারী সামাজকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলীল করা।

সঠিক উত্তর - ১। ঘ ২। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। সাম্যবাদের অর্থ কি?
২। প্লেটোর মতে সম্পত্তিগত সাম্যবাদ কি?
৩। প্লেটোর মতে পরিবারগত সাম্যবাদ কি?
৪। এরিষ্টটল প্লেটোর সাম্যবাদকে কি গ্রহণ করেছিলেন?
৫। প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনাকে কেন নেতিবাচক (Negative) বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য প্রণীত প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার বর্ণনা দিন।
২। প্লেটোর সাম্যবাদ কি? আধুনিক সাম্যবাদের সাথে প্লেটোর সাম্যবাদ কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

৩

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন : এরিস্টটল এবং তৎপরবর্তী রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা: এরিষ্টটলকে বাদ দিয়ে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তা কল্পনা করা যায় না। তাঁকে রাজনীতি বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। কারণ একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রাজনীতি বিজ্ঞানের ভিত তিনিই প্রথম তৈরী করেন। তিনি ছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র এবং দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে তাঁর রচিত *'দি পলিটিকস্ই'* প্রধান। এ ছাড়াও তাঁর *'দি এথিকস্'*, *'দি লজিক'* ইত্যাদি পুস্তকও উল্লেখ যোগ্য। তবে *'দি পলিটিকস্'* গ্রন্থেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে ষ্ট্যাগিরা নামক স্থানে তাঁর জন্ম এবং চালসিস নামক শহরে ৩২২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 'লাইসিয়্যুম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরিষ্টটলের সময় গ্রীসের রাজনৈতিক অংগন ছিল অস্থির। প্লেটোর একাডেমিতে অধ্যয়নের সময় ও তার পরে তিনি গ্রীসের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সম্মূখীন হন। ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু এই পরিস্থিতি তাঁকে ব্যথিত করেছিল। অসহনীয় এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে ঐক্য ও সংহতি বিধান নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর চিন্তার মূল লক্ষ্য। সমকালীন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে রাজনীতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। প্লেটোর মত কোন আদর্শিক দৃষ্টিতে নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে তিনি রাজনীতি অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তী পাঠগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা এরিষ্টটল পলিবিয়াস ও ফিপোকার রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচিত হতে পারি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ : এরিষ্টটল;*
- *পাঠ-২ : এরিষ্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগ;*
- *পাঠ-৩ : এরিষ্টটলের দাসতত্ত্ব;*
- *পাঠ-৪: এরিষ্টটলের বিপ্লব তত্ত্ব;*
- *পাঠ-৫: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিষ্টটলের অবদান;*
- *পাঠ-৬: এপিকিউবিয়ানবাদ ও ষ্টোয়িক দর্শন;*
- *পাঠ-৭: রোমান রাষ্ট্রচিন্তা: পলিবিয়াস ও সিসেরো।*

পাঠ-১

এরিস্টটল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সাথে পরিচিত হতে পারবেন;
- রাষ্ট্র সম্পর্কে এরিস্টটলের ধ্যানধারণার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সংগে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এরিস্টটলের রাষ্ট্র চিন্তা মূলত: তাঁর *'দি পলিটিকস্'* পুস্তকের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। আটটি পুস্তক সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থের বিন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি সমগ্র কোন গ্রন্থের একটি ভূমিকা বিশেষ। প্লেটোর ন্যায় এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানত: নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক। এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি জানা দরকার। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত কিছু যাচাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণই হলো তাঁর পদ্ধতির মূল কথা। এ ধরনের পদ্ধতিকে আরোহী পদ্ধতি (inductive method) বলা হয়।

নিম্নে এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন, একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম

প্লেটোর ন্যায় এরিস্টটল নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে রাষ্ট্রনীতিকে তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'রাষ্ট্রই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ সংস্থা–রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে, তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।' তবে অধ্যাপক স্যাবাইনের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় যে, নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে এরিস্টটল প্লেটোর অনুসৃত ধারা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এ কারণে উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তায় নীতিশাস্ত্র এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন, একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

রাষ্ট্র বিবর্তনের ফল। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব

পূর্বসুরীদের মত এরিস্টটলও মনে করতেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এরিস্টটল আরও মনে করতেন মানুষের প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিহিত। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উপায়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বভাবগত প্রবৃত্তি হল রাষ্ট্রে বসবাস করা। কারণ 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব।' প্রকৃতি প্রদত্ত এই প্রবণতাই মানুষকে রাষ্ট্র নামক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্যান্য জীবের মত মানুষ শুধু বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট নয়,মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে উত্তম ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এ প্রবণতার জন্যই মানুষ সংগঠন তৈরী করে থাকে। এরিস্টটলের মতে,'রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সংঘের পূর্ববর্তী।' তিনি বলতে চান রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের বাইরে

থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তি বা অন্যান্য সংঘ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে। রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা। মানবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে এবং তাদের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে ব্যক্তি, সংঘ ইত্যাদি। একটির অনুপস্থিতিতে যেমন দেহ পূর্নাঙ্গতা লাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনি ব্যক্তি বা সংঘ ব্যতীত রাষ্ট্র পূর্ণ হতে পারে না। আবার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যেমন কোন বিশেষ অঙ্গ অর্থহীন হয়ে যায়, তেমনি রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তি বা সংঘ বিচ্ছিন্ন হলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে এরিস্টটলের জৈব ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেছেন যে, মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের শুরু হয়েছিল পরিবার গঠনের মধ্যে দিয়ে। তিনি আরও বলেন' 'পরিবার গঠনের পেছনে কোন বহি:শক্তি কাজ করে নি।' কারণ পুরুষ ও নারীর একত্র বসবাস করার প্রবণতা প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু পরিবার মানুষের জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী সমস্যার মধ্যে সীমিত কিছু মেটাতে পারে মাত্র। তাই আরও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিবার নিয়ে গ্রাম বা সমিতি গঠন করলো। পরবর্তীতে মানুষ দেখলো তার চেয়েও উন্নত সংঘ প্রয়োজন, কারণ মানুষ পূর্ণতা চায়। আর চূড়ান্ত পূর্ণতার লক্ষ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই এলো রাষ্ট্র। তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল রাষ্ট্রই মানুষকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি "স্বয়ংসর্ম্পূর্ণ" একক বিশেষ।

মানুষ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো তাহলে পরিবার, গ্রাম, সংঘ বা রাষ্ট্র কোন সংগঠনেরই প্রয়োজন হতো না। মানব প্রকৃতির এই অ-স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উত্তমের প্রতি প্রতিনিয়ত আকাংখা, ইত্যাদিই হলো রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূল কারণ। এরিস্টটল সমসাময়িক বিপরীত চিন্তাবিদ তথা সফিষ্ট সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব -'রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান'কে অসার প্রমাণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের অবতারনা করেছেন।

সমালোচনা

প্রকৃতপক্ষে বহুধর্মী উপাদানের মিলনের ফলেই রাষ্ট্রের আর্বিভাব হয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরিস্টটল কতকগুলো পূর্বানুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন, প্রথমত: রাষ্ট্র স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ পরিবার, সমিতির উৎপত্তি স্বাভাবিক। এবং এদের থেকেই উদ্ভুত হয়েছে রাষ্ট্র। দ্বিতীয় পূর্বানুমান হলো রাষ্ট্র একটি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমালোচকেরা তাঁর এ দু'টি ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। তারা বলতে চান রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাভাবিক হলেও সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মতি, ধর্ম, রক্তের সম্পর্ক এমনকি বল প্রয়োগ ইত্যাদিরও অবদান আছে। ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে বহুধর্মী উপাদানের মিলনের ফলেই রাষ্ট্রের আর্বিভাব হয়েছে।

পরিবার থেকে রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে এরিস্টটল ধারণা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হয়তো তার এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। পরিবার গঠনের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বেও হয়তো মানুষ কোন না কোন ভাবে জীবন যাপন করতো। এই প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের সাথে সমন্বয়হীনতা তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে।

তাঁর জৈবতত্ত্ব তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলীন- এরূপ ধারণা সত্য নয়। জৈব তত্ত্বের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার পার্থক্য ভুলে গিয়েছেন। ফলে তার তত্ত্বে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের স্থায়ী চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার যুক্তিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এটি একটি মৌলিক সংযোজন। পরবর্তী পাঠসমূহের ভেতর দিয়ে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সারকথা:

এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। 'দি পলিটিক্স' গ্রন্থে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এরিস্টটল রাষ্ট্রকে একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার নিরিখে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনে রাষ্ট্র খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরিবার সমাজ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। রাষ্ট্রকে তিনি একটি জৈবিক সত্তার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব ভেবেছেন এবং আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের জীবন যাপন সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলের জন্মস্থান কোথায়?
(ক) এথেন্স; (খ) স্পার্টা;
(গ) মেসিডোনিয়া; (ঘ) ষ্টাগিরা।

২। *দি পলিটিকস* পুস্তকের লেখক কে?
(ক) প্লেটো; (খ) এরিস্টটল;
(গ) সক্রেটিস; (ঘ) সফিষ্ট সম্প্রদায়।

৩। 'রাষ্ট্র একটি কৃত্তিম সংগঠন' এটি কার উক্তি?
(ক) প্লেটোর; (খ) এরিস্টটলের;
(গ) সফিষ্ট সম্প্রদায়ের; (ঘ) সক্রেটিসের।

৪। রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সংগঠন-কারণ :-
(ক) রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি; (খ) রাষ্ট্র একটি চুক্তির ফল;
(গ) মানুষ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবে রাজনৈতিক জীব:
(ঘ) রাষ্ট্র বল প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট।

সঠিক উত্তর ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪।গ

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটল কি ভাবে সমসাময়িক গ্রীক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?
২। আরোহী পদ্ধতি কি?
৩। রাষ্টের জৈব ধারণা কি?
৪। কি ভাবে পরিবার ও সমবায় থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং কেন?

খ) রচনামূলক প্রশ্নঃ
১। সমালোচনাসহ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এরিস্টটলের তত্ত্ব আলোচনা করুন।
২। 'রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সংঘের পূর্ববর্তী'-এরিস্টটলের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কি? আলোচনা করুন।

পাঠ-২

এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ জানার মাধ্যমে তুলনামূলক রাজনীতির ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

সরকারের শ্রেণী বিভাগ রাজনীতি অধ্যয়নের বিশেষত: তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। এরিস্টটল তৎকালীন সময়ের প্রায় ১৫৮টি দেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সেগুলো পর্যালোচনা করেছিলেন এবং একটি উত্তম সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। *'দি পলিটিকস্'* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এরিস্টটল বিভিন্ন ধরনের সংবিধান, সরকার এবং তাদের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এরিষ্টটলের নিকট রাষ্ট্র, সংবিধান ও সরকার সব ছিল অভিন্ন।

এরিস্টটল কর্তৃক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার হওয়া দরকার, তা হলো আধুনিক কালে আমরা সরকার, রাষ্ট্র, সংবিধান প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোকে স্বতন্ত্র মনে করি এবং পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে থাকি। কিন্তু এরিস্টটল এগুলোকে অভিন্ন মনে করতেন না। তিনি এ প্রত্যয়গুলো আলাদাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন নি। এর কারণ সম্ভবত: তৎকালীন গ্রীসের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। তাঁর সমসাময়িক গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) এবং গণতান্ত্রিকদের (Democracy) মধ্যে ক্ষমতার প্রতিনিয়ত অদল বদল হতো। আর প্রায়শই তা হতো চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে। উপরোক্ত শ্রেণী দু'টির যে কোন একটি ক্ষমতাচ্যুত হলে শুধু সরকার নয়, রাষ্ট্রের চরিত্র বা প্রকৃতিই বদলে যেতো। তাই এরিস্টটলের একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সংবিধান, রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন এবং এদের যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এরিস্টটল সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে, 'সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহের বিন্যাসব্যবস্থা।' অন্যকথায় এরিস্টটলের মতানুযায়ী বলা যায়, সার্বভৌম নগর রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ই সংবিধান। এরিস্টটল কর্তৃক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণী বিভাগ কোন নতুন আবিষ্কার ছিল না। কেননা, প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থের ৮ম পুস্তকে সরকারের যে শ্রেণী বিন্যাস করেছিলেন, এরিস্টটল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, প্লেটো যেখানে সমাপ্ত করেছিলেন এরিস্টটল সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন।

এরিস্টটলের মতে নগর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রধানত: দু'টি। যথা-

(ক) সৎ জীবন যাপনে সাহায্য করা এবং (খ) ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বিধান করা। সকলের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ করাই উত্তম লক্ষ্য। কিন্তু সকল সংবিধান এ নীতিতে অবিচল থাকে না। তিনি বলেন যে, কোন কোন সংবিধানে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সকলের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য দেন। এ জাতীয় সংবিধানই যথার্থ বা সঠিক (Real)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়। এ জাতীয় সংবিধান হলো বিকৃত (Perverted) সংবিধান। তিনি আরও বলেছেন শাসনক্ষমতা একজন, অল্প কয়েকজন এবং বহুজনের হাতে ন্যাস্ত থাকতে পারে। সুতরাং শাসকের গুণ (অভিন্ন স্বার্থ) বা সংকীর্ণ স্বার্থ এবং শাসকের সংখ্যা (এক জন, কয়েকজন বা বহুজন) এ

শাসকের গুণ ও সংখ্যা এ দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করেই এরিষ্টটল সরকারের শ্রেণী বিভাগ করেছেন

দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে এরিস্টটল সংবিধান বা রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সঠিক বা খাঁটি সংবিধানে একজন শাসক বা কয়েকজন শাসক বা বহুজন শাসক সমাজের সকলের অভিন্ন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন পরিচালনা করেন। এরিস্টটল একজনের শাসনকে রাজতন্ত্র, অল্প কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র এবং বহুজনের শাসনকে পলিটি বলেছেন। শাসকের সংখ্যা একজন, অল্প কয়েকজন বা বহুজন থাকলেও যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা যদি সকলের অভিন্ন স্বার্থের প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হন তবে সে অবস্থায় যে ধরনের সংবিধান পাওয়া যাবে তাকে এরিস্টটল বলেছেন বিকৃত সংবিধান। তাঁর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের বিপরীত হলো স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতন্ত্রের বিপরীত হলো সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র এবং পলিটির বিপরীত হলো গণতন্ত্র। নিম্নের ছকের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসটির প্রকাশ করা যায়:

শাসকের সংখ্যা	শুদ্ধ বা স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
মুষ্টিমেয়র শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজনের শাসন	পলিটি	গণতন্ত্র

অধ্যাপক বার্কার এরিস্টটলের সংবিধান বিভাজনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এরিস্টটলের এ বিভাজনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিকৃত সংবিধান মূলত: অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার প্রতিফলন।

পলিটি বলতে তিনি একধরনের ভারসাম্য রক্ষাকারী মধ্যবিত্তের শাসন বলতে চান।

এরিস্টটল উপরোক্ত বিভাজনের মধ্যে পলিটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। যদিও এটি বহুজনের শাসন, তবুও বিশেষ অর্থে পলিটি বলতে তিনি একধরনের ভারসাম্য রক্ষাকারী মধ্যবিত্তের শাসন বলতে চান। কারণ এখানে চরম প্রকৃতির ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলোকে পরিহার করে তাদের গুণাবলীর মিশ্রণ ঘটানো যায়। এটি ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে দিয়ে এরিস্টটল সামগ্রীক স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাষ্ট্রের, সরকারের ও সংবিধানের স্বাভাবিক লক্ষ্য হলো সামগ্রীক কল্যাণ সাধন এ সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

সমালোচনা

- গণতন্ত্রের প্রতি আক্রমনাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় এরিস্টটলের সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে। তিনি গণতন্ত্রকে বিকৃত সংবিধান বলেছেন। এটি আজকাল গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তথা সামগ্রীক কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে বর্তমানে মনে করা হয়।

- রাজতন্ত্র উত্তম হতে পারে, এমন বক্তব্য বর্তমানে অচল। রাজতন্ত্র অতি সহজে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়ে থাকে। তাই এখানে বিকৃতির ঝুঁকি বেশি।

- সরকার, সংবিধান ও রাষ্ট্রকে একই অর্থে ব্যবহার করাকে বর্তমানে আর যুক্তিসংগত মনে করা হয় না। বর্তমানে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ক্ষমতাপৃথকীকরণ ইত্যাদি ধারণাগুলোর সাথে তাঁর শ্রেণীবিন্যাস সংগতিপূর্ণ নয়।

- বর্তমানে সরকারের শ্রেণীবিভাগের প্রশ্নে শুধুমাত্র সংখ্যা ও উদ্দেশ্য বা গুণ নির্ভর বিভাজন অচল। অধুনা জটিল ধরনের জাতি রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও সংঘাতের

আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাই সরকার বিভাজনের মানদন্ড ভিন্নতর ও বহুমুখী।

তবে শুধুমাত্র আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এরিস্টটলের প্রতি অন্যায় করা হবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি এ বিভাজন করেছিলেন, এ কথাটি মনে রাখা আমাদের কর্তব্য।

সারকথা:

এরিস্টটল সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তবে তাঁর কাছে সরকার, সংবিধান ও রাষ্ট্রের অর্থ ছিল অভিন্ন। তিনি সংখ্যা এবং গুণ এ দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। এটি করতে গিয়ে তিনি স্বাভাবিক রূপ যথা: নির্বিশেষে সমাজের সকলের স্বার্থ দেখা এবং বিকৃতরূপ যথা: ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে বুঝিয়েছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটিকে তিনি স্বাভাবিক রূপ এবং যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে বিকৃত রূপের সরকার বলেছেন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে আধুনিক সমালোচকগণ এরিস্টটলের এ শ্রেণীবিন্যাসকে নানামুখী সমালোচনা করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক কালে সরকার, রাষ্ট্র এবং সংবিধানকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুঝায় কারণ-
ক. এর ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা উপকৃত হয়;
খ. এর ফলে স্বৈরতান্ত্রিক চেতনা উপকৃত হয়;
গ. এর ফলে অভিজাততন্ত্র উপকৃত হয়;
ঘ. এর ফলে ধনিকতন্ত্র উপকৃত হয়।

২। পলিটি স্বাভাবিক রূপ, এর বিকৃতরূপ হলো-
ক. রাজতন্ত্র; খ. অভিজাততন্ত্র;
গ. গণতন্ত্র; ঘ. স্বৈরতন্ত্র।

৩। রাজতন্ত্রে শাসক বা শাসকবর্গ 'বিকৃতভাবে শাসন করলে যে রূপ পাওয়া যায় তা হলো:
ক. রাজতন্ত্র; খ. অভিজাততন্ত্র;
গ. পলিটি; ঘ. স্বৈরতন্ত্র।

সঠিক উত্তর ১। ক ২। গ ৩। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। *'দি পলিটিকস্'* গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে এরিস্টটল সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন?
২। পলিটি কি?
৩। এরিস্টটলের মতে কেন মধ্যবিত্ত দ্বারা শাসিত সরকার উত্তম?
৪। সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি দু'টি কি?
৫। সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে এরিস্টটল কাকে অনুসরণ করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দিন।
২। সরকার সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা আলোচনা করুন। তিনি কোন্ প্রকারের সরকারকে উত্তম বলে চিহ্নিত করেছেন এবং কেন?

পাঠ-৩

এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ এরিস্টটলের দাসতত্ত্বের সমালোচনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

দাসতত্ত্ব এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তবে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে যেখানে দৃশ্যত ও আনুষ্ঠানিক বিচারে 'সকল মানুষ সমান' এমন চিন্তা সর্বজনভাবে স্বীকৃত। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছিল। সমসাময়িক গ্রীক সমাজ ছিল দাস নির্ভর সমাজ। নগর রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে দাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই দাসদের কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নগর রাষ্ট্রের প্রতি তিনজনের মধ্যে দুজনই ছিল দাস। মাঝে মধ্যে দাস বিদ্রোহ নগর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অস্থির করে তুলতো। তাছাড়া সফিষ্ট সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় দাসদের সমানাধিকারের কথা বার বার উচ্চারিত হতো। উপরোক্ত রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে একজন যুক্তিবাদী ও সংরক্ষণবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে এরিস্টটল নগর রাষ্ট্রে দাস ব্যবস্থাকে শুধু সমর্থনই করেন নি, এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে গিয়েছেন।

নগর রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে দাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এরিস্টটল তাঁর *'দি পলিটিকস্'* পুস্তকের ১ম অধ্যয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি [পূর্ববর্ত্তী পাঠ দ্রষ্টব্য] এরিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় পরিবারকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে তিনি দাস এবং দাসব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল আইনগত, নৈতিক, অর্থনৈতিক বিবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন।

- তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, দাসরা জৈব বা সজীব যন্ত্রপাতির সামিল (Animate tools)। তিনি বলতে চান গৃহস্থালী কাজের জন্য কিছু উপকরণের দরকার। আর এ সব উপকরণ দু' প্রকার–যথা অজৈব (inanimate tools) ও জৈব উপকরণ (animate tools)।

  তাঁর যুক্তিতে দা কূড়াল ইত্যাদি যেমন 'অজৈব যন্ত্রপাতি' তেমনি গৃহস্থালী কাজের জন্য গৃহপালিত পশু, দাস ইত্যাদি 'জৈব যন্ত্রপাতি।' এগুলো মূলত: জীবন্ত সম্পদ। এ সব হাতিয়ার (instrument) ব্যতীত গৃহস্থালী কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে গৃহস্থালী পশু ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পশুর যেমন যুক্তিবোধ নাই, দাসেরও তেমনি যুক্তিবোধ নাই। আর এ জন্যই তারা দাস। এ কারণে, তাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীনতা থাকার কোন অর্থ নাই। সুতরাং সফিষ্ট সম্প্রদায়ের যুক্তির বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে এরিস্টটল বলতে চান, দাস ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, তথা কৃত্রিম নয়।

  দাস ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, তথা কৃত্রিম নয়।

- এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল যুক্তির অবতারনা করেছেন এ ভাবে যে, সব সময়ই কোন গঠিত সমগ্রের সেই অংশ কর্তৃত্ব করে থাকে যে অংশ উৎকৃষ্ট। এরিস্টটল বলতে চান যে, প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান নয়। কিছু লোক জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অধিকারী এবং উক্ত প্রজ্ঞার কারণে তারা শুধু আদেশ দানেরই উপযুক্ত। অন্যদিকে অধিকাংশ লোক

উত্তমের অধীনে অধমের থাকার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই।

শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির বলে শক্তিমান। তারা শুধুমাত্র হুকুম তামিল করার উপযুক্ত। প্রজ্ঞার অভাব আছে বলে এরা হুকুম দানে অক্ষম। অন্য কথায় প্রভু তাঁরা যারা জ্ঞানী এবং দাস তারা যারা প্রজ্ঞাবানের আদেশ মান্য করে। প্রভুরা মস্তিস্ক ও আত্মা দ্বারা চালিত হয়। আর দাসেরা দেহ বা আবেগ দ্বারা চালিত হয়। দেহ প্রজ্ঞার অধীনে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উত্তমের অধীনে অধমের থাকার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই।

- এরিস্টটল উন্নত ও নৈতিক জীবন যাপনের লক্ষ্যের সাথে দাস ব্যবস্থাকে এক করে দেখেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রভুদের যদি গৃহস্থালী কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তবে উন্নত জীবন নির্দেশনার জন্য তারা পর্যাপ্ত সময় 'অবসর' পাবেন না। তাই রাষ্ট্রের পরম লক্ষ্য তথা উন্নত নৈতিক জীবন অর্জনের নিমিত্তে দাসব্যবস্থা অপরিহার্য।

দাস প্রথাটি দাস, প্রভু এবং নগর রাষ্ট্র সবার জন্যই কল্যাণকর

- এরিস্টটল যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দাসদের কল্যাণার্থেই তাদের দাস হয়ে থাকা উত্তম। কেননা প্রজ্ঞার অভাব থাকায় তাদের পক্ষে স্বাধীন ও মানবীয় সুস্থ্য জীবন যাপন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রভুর অধীনে থেকে তাঁর গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাসেরা নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। এমন হলে একদিকে দাসরা মুক্ত মানুষ হতে পারে, অন্যদিকে প্রভুরা দাসের উপর উৎপাদনের ভাব ছেড়ে দিয়ে উন্নত জীবন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারে। সুতরাং দাস প্রথাটি দাস, প্রভু এবং নগর রাষ্ট্র সবার জন্যই কল্যাণকর। তবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে চান যে, দাসদের উপর উৎপাদনের ভার ছেড়ে দিয়ে অবসরকে যদি প্রভুরা সদ্ব্যবহার না করেন তবে দাস ব্যবস্থার কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। তিনি বলতে চান দাসদের সৃষ্ট অবসরকে প্রভুরা যদি উন্নত জীবন রচনায় ব্যবহার করতে না পারেন, তবে ঐ সব প্রভুরা প্রভু থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। মোট কথা এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, অকৃত্রিম এবং নগর রাষ্ট্র ও মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সমালোচনা

এরিস্টটল 'দাস ব্যবস্থা' সমর্থন করে তার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তৎকালে এবং বর্তমানে তাঁর এ তত্ত্ব বিপুলভাবে সমালোচিত হয়েছে।

- এরিস্টটলের এ তত্ত্ব মানবতা বিরুদ্ধ। সমতার নীতিকে তিনি অস্বীকার করে সার্বজনীন মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে গিয়েছেন।
- তিনি যে নীতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চেয়েছেন, তাও খুব যুক্তিযুক্ত নয়। 'মানুষ মাত্রই যুক্তিবাদী এবং পূণ্যের প্রতি অনুরক্ত'-এ বানীই সত্যবানী বলে তৎকালীন সংশয়বাদী ও ষ্টোয়িকবাদীরা প্রচার করে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বর্তমান কালেও এরূপ দর্শনই সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছে।
- দাসদেরকে পশু ও গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির সাথে তুলনা করে এরিস্টটল গোঁড়া ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির পরিচয় দিয়েছেন।
- দাসতত্ত্বের ভেতর দিয়ে তার গ্রীক অহংবোধের সংকীর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কারণ, গ্রীকরা দাস হতে পারে না, এমন কিছু বক্তব্যও তিনি দিয়েছেন।
- তৎকালীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে দাসদের মধ্যে যে উপর্যুপরী বিদ্রোহ সংঘটিত হতো তা তাঁকে কিছুটা বিব্রত করে তুলেছিল। তিনি সফিষ্ট সম্প্রদায়ের মত প্রগতির পথে চিন্তা না করে রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিতে দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিহত করে ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক সমাজের মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন। তবে এ কথা বলা যায় যে, সমতা ও মানবতার দৃষ্টিকোন থেকে এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন বলে মনে হলেও এবং আধুনিক যুগে তা দৃশ্যত নিন্দনীয় হলেও বাস্তবে বর্তমানে আমরা কি দেখি? মানবতার নামে বিত্তহীন মানুষ এখনও সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনীদের ইচ্ছার

দাস। সুতরাং এরিস্টটল অবাস্তব চিন্তা করেছিলেন, এমন কথা বলার কোন ভিত্তি নাই।

সারকথা:

তৎকালীন গ্রীসের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। সফিষ্ট সম্প্রদায়ের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান নিয়ে এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে যথার্থ বলেছেন। তা'ছাড়া আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ বলেছেন এবং দাস ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছিলেন। তবে তার এ তত্ত্ব বর্তমানের সার্বজনীন মানবতার দৃষ্টিকোন থেকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলের সমসাময়িক গ্রীক সমাজ ছিল–
   (ক) ধনতান্ত্রিক;
   (খ) দাসভিত্তিক;
   (গ) সমাজতান্ত্রিক;
   (ঘ) সামন্ততান্ত্রিক।

২। এরিস্টটল দাসব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলে মনে করতেন, কারণ–
   (ক) মানুষ সকলেই সমান;
   (খ) মানুষে মানুষে জ্ঞানে বা প্রজ্ঞার পার্থক্য আছে;
   (গ) অধিকাংশ দাস ছিল অ-গ্রীক;
   (ঘ) দাসব্যবস্থা গ্রীক সমাজে প্রচলিত ছিল।

৩। এরিস্টটল দাসদেরকে মনে করতেন–
   (ক) সজীব যন্ত্রপাতির সামিল;
   (খ) বুদ্ধিমান প্রাণী;
   (গ) শাসক হওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ;
   (ঘ) হুকুম তামিল করার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ।

সঠিক উত্তরঃ ১। খ ২। খ ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। দাস সমাজ কি?
২। নৈতিকতার দৃষ্টিতে কেন এরিস্টটল দাসব্যবস্থা সমর্থন করেছিলেন?
৩। দাসব্যবস্থা সম্পর্কে সফিষ্ট সম্প্রদায় কি দৃষ্টিভংগি পোষণ করতেন?
৪। এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান দৃষ্টিতে কি কি সমালোচনা আছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২। সমালোচনাসহ এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

এরিস্টটলের বিপ্লবতত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ❑ এরিস্টটলের বিপ্লবতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ বিপ্লব দমনের উপায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিপ্লবের আধুনিক অর্থ এবং এরিষ্টটলের কাছে বিপ্লবের অর্থ এক নয়

পূর্বের পাঠ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এরিস্টটলের সমসাময়িক গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতো। ঘন ঘন সরকার ও সংবিধান পরিবর্তন, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। বলাবাহুল্য, এ অবস্থা এরিস্টটলের মত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিল। এরিস্টটল গভীর ভাবে তাঁর অভিজ্ঞানবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পূর্বক বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি প্রায় ১৫৮টি দেশের সংবিধান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এ ভাবেই তিনি তাঁর বিপ্লবতত্ত্ব দাঁড় করেছিলেন। এ তত্ত্বে তিনি বিপ্লবের কারণ এবং তা নিরসনের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি সমাজের আমূল পরিবর্তন। যেমন ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি। এরিস্টটল কিন্তু বিপ্লব বলতে এর আধুনিক অর্থ বোঝান নি। তাঁর কাছে বিপ্লবের অর্থ ছিল ভিন্ন। এরিস্টটল 'বিপ্লব' শব্দটি ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সরকার পরিবর্তন, সংবিধান পরিবর্তন, শাসক শ্রেণীর পরিবর্তনকে তিনি বিপ্লব অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর কাছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উপরোক্ত পরিবতর্নই ছিল বিপ্লব। বিপ্লব কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এরিস্টটল বিপ্লবের কারণগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন সাধারণ কারণ ও বিশেষ কারণ।

সাধারণ কারণ: বিপ্লবের সাধারণ কারণকে এরিস্টটল মনস্তাত্ত্বিক, মুনাফা ও সম্মান এবং প্রাথমিক অবস্থান এ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা মনস্তাত্ত্বিভাবে মানুষকে বিপ্লবী করে তোলে

মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য: এরিস্টটল মনে করতেন যেকোন ধরনের সংবিধানে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণাটি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবে অর্থ ও এর প্রয়োগ সর্বত্র সমান নয়। এ রূপ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের ধারণা ও বাস্তবে এর প্রয়োগের মধ্যে যে তফাৎ থাকে বস্তুত: তাই নাগরিকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপ্লবের বীজ হিসাবে কাজ করে থাকে। *পলিটিকস্* পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এরিস্টটল বিষয়টি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। ন্যায়বিচার থেকে যারা বঞ্চিত তারা মনে করেন যে, সমাজে অসাম্য বিরাজ করছে। অতত্রব সাম্য প্রতিষ্টার জন্য তারা প্রবৃত্ত হন। তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। সুতরাং ন্যায়বিচারের নামে এবং অসাম্যই বিপ্লবের প্রধান কারণ। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষমতায় নাই এমন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ক্ষমতাসীনরা যোগ্যতায় তাদের চাইতে হীন। সুতরাং তারা ক্ষমতা লাভের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। যখন ধনিকতন্ত্র থাকে তখন গণতান্ত্রীরা সাধারণত এরূপ মনে করার জন্যই বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। আবার বিপরীতভাবে ধনিকতন্ত্রীরা মনে করেন যে, জ্ঞানে, গুণে, সম্পদে তারা অন্যান্যদের চেয়ে উন্নত কিন্তু অধিকার ভোগ করেছেন অন্যান্যদের মত। এই মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা মর্যাদা পাওয়ার জন্য বিপ্লবী হয়ে ওঠেন।

- সম্মান ও মুনাফা: রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে মুনাফা ও সম্মান লাভের বাসনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই কখনও কেউ কেউ মুনাফা ও সম্মান লাভের

প্রত্যাশায় পরিবর্তন আনতে চান। আবার বিপরীত ভাবে মুনাফা ও সম্মানহানিকে রোধ করার নিমিত্তেও মানুষ বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে।

- প্রাথমিক অবস্থান: প্রাথমিক অবস্থান অনেক সময় বিপ্লবের সাধারণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঔদ্ধত্য, ভয়, ঘৃণা, রাষ্ট্রের কোন অংশের অ-আনুপাতিক বৃদ্ধি, অবহেলা, নির্বাচনী ষড়যন্ত্র, জনমতকে উপেক্ষা করা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা প্রভৃতি কারণে বিপ্লব ঘটতে পারে। বিপ্লবের বিশেষ কারণ বলতে এরিস্টটল বিশেষ সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থায় যে কারণে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে তাকে বুঝাতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে এরিস্টটল গভীরভাবে চিন্তা করে নিম্নোক্ত উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন শাসন ক্ষমতা যখন গণতন্ত্রীদের হাতে থাকে তখন তাদের জনপ্রিয় নেতারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় তারা ধনীদের উপর আক্রমনাত্মক মনোভাব পোষণ করেন। ফলে ধনীরা তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে বিপ্লবী তৎপরতায় লিপ্ত হন। সাধারণত: এ ব্যবস্থায় 'গণবক্তারা' বার বার কথামালার মাধ্যমে ধনীদের উপর আক্রমণ চালান। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি কারণে বিপ্লব ঘটে থাকে, যেমন-রাজপরিবারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং রাজাদের স্বেচ্ছাচার। নির্বিচার স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে জনগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে চান। অভিজাততন্ত্রে এক পর্যায়ে অভিজাততন্ত্রীরা আরও বিত্তের লোভে জনগণকে শোষণ করে। ফলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সম্পদ ও পদ ভাগাভাগি নিয়েও অভিজাত শাসকদের মধ্যে অর্ন্তকলহ অনেক সময় বিপ্লবে রূপ নিয়ে থাকে। পলিটি ধরনের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের ভারসাম্য সম্পর্কিত কিছু দুর্বল দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ ভারসাম্যের হেরফের হলেই বিপ্লব ঘটে যায়। তবে এরিস্টটলের মতে অন্যান্য ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থাটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী (Stable)।এভাবে এরিস্টটল বিজ্ঞানসুলভভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

বিপ্লব প্রতিকারের উপায়: এরিস্টটল বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেই খান্ত ছিলেন না, কিভাবে বিপ্লব প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি কতিপয় মূল্যবান সুপারিশ করে গেছেন। যেমন:

- তিনি বলেছেন সরকার যেনো কোন ক্রমেই জনগণকে প্রতারণা না করে। জনগণের আস্থা অর্জন করা হবে শাসক বা শাসকদের অন্যতম লক্ষ্য। কারণ প্রতারিত জনগণ প্রতারণাকারী শাসককে কখনও ক্ষমা করে না।

- আইন লংঘন ও বিশৃঙ্খলাকে যথাসম্ভব মোকাবিলা করা উচিত। কারণ এ সব ছোট খাট বিষয় পুঞ্জিভুত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে থাকে।

- শাসক ও শাসিতের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শাসককে যত্নবান হতে হবে। শাসিত থেকে শাসকের বিচ্ছিন্নতাবোধ নানাভাবে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক ও সেতুবন্ধন বিপ্লব নিবারণের অন্যতম কার্যকর উপায়।

- শাসককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রভাবশালী ও অভিজাত ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ, প্রভাবশালীরা সহজে অন্যান্যদেরকে বিপ্লবের পথে সংগঠিত করতে পারেন। উপরোক্ত শ্রেণীর উপর কড়া নজর রাখা দরকার।

- গণতন্ত্রীদের উচিত ধনীদের প্রতি সম্মান দেখানো, আবার ধনিকতন্ত্রীদের উচিত সর্বসাধারণের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকা। রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী ও অঞ্চলের সম উন্নয়নের চেষ্টা করা দরকার। কারণ একটি রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বৈষম্য বিপ্লব ডেকে আনে।

- বৈষম্যমূলক ভাবে কাউকে অধিক সম্মান না দেখিয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে সম্মান দিতে হবে। ফলে সকলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে।

- সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ থেকে বিরত রেখে বিপ্লব প্রতিরোধের কথা এরিস্টটল বলেছেন। কারণ সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ প্রবণতা জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরিস্টটল আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিপ্লব সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তার অধিকাংশই বর্তমান কালের জন্যও প্রযোজ্য ও ক্রিয়াশীল।

সারকথা:

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তাঁর বিপ্লব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা সরকার বদল, সংবিধান বদলকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সাধারণ ও বিশেষ এ দুভাবে বিপ্লবের কারণকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বিপ্লব দমনের জন্য কতিপয় সুপারিশও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটল কতগুলো দেশের সংবিধান সংগ্রহ করেছিলেন?
(ক) ১৫০টি; (খ) ১৫৮টি; (গ) ১০০টি; (ঘ) ৫০টি।

২। এরিস্টটলের নিকট বিপ্লবের অর্থ ছিল–
(ক) সামজের আমূল পরিবর্তন;
(খ) দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়ণ;
(গ) শোষিত মেহনতী জনতার বিজয়;
(ঘ) সরকার, সংবিধান বা শাসকদের যে কোন প্রকার পরিবর্তন।

সঠিক উত্তর ১। খ ২। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন।

১। আধুনিক অর্থে বিপ্লব কি?
২। এরিস্টটল বিপ্লব বলতে কি বুঝিয়েছেন?
৩। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কত প্রকার?
৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন্ শ্রেণী বিপ্লবী হয়ে ওঠে এবং কেন?
৫। বিপ্লব দমনের প্রধান তিনিটি উপায় কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটলের মতে বিপ্লব কি? কেন বিপ্লবের উৎপত্তি হয়?
২। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ এবং তা দমন করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ এরিস্টটলের অবদানের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ❑ এরিস্টটল হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' এ উক্তিটির সত্যতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর অবদানসমূহ পরীক্ষা করে এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা যায়। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের বাস্তবতার নিরিখে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু কালের আবর্তে তাঁর কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা বর্তমানেও বজায় আছে। সম্ভবত: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলই সবচেয়ে বেশি কালোত্তীর্নের মর্যাদা পেয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ নিম্নরূপ:

এরিষ্টটল ছিলেন বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ

- এরিস্টটলই রাজনীতি বিজ্ঞানকে সর্ব প্রথম একটি 'স্বতন্ত্র' (independent) মর্যাদায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরু প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল দার্শনিকোচিত (philosophical) অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা নয় বরং 'কি হওয়া উচিত' এটিই ছিল প্লেটোর মূল জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া নীতিশাস্ত্রকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়ে প্লেটো রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্রের অধীনস্থ করেছেন। ফলে, প্লেটোর হাতে রাষ্ট্রনীতি কোন পৃথক ও স্বাধীন মর্যাদা পায় নি। কিন্তু এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বলেছেন Master science 'প্রভূত্বকারী বিজ্ঞান।' নীতিশাস্ত্রকে তিনি ম্যাকিয়াভেলীর মত বর্জন করার কথা বলেন নি। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির উপর নীতিশাস্ত্রের প্রধান্যকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'স্বতন্ত্র' মর্যাদায় সমাসীন করে গিয়েছেন।
- এরিস্টটল রাজনৈতিক বিষয়গুলো অধ্যয়নের যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। গ্যাটেলের মতে 'এই পদ্ধতির ফলে রাষ্ট্র সম্মন্ধীয় আলোচনা বিজ্ঞানের পর্যায়ভূক্ত হতে পেরেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাস্তব গবেষণা এই আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয় পঠন ও পাঠনের জন্য এরিস্টটল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'
- বাস্তববাদীতা এবং অভিজ্ঞানবাদকে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দর্শন ঘেঁষা, অনুমান ও কল্পনা নির্ভরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সমাজ বিজ্ঞানের একটি শক্তিশালী শাখায় উন্নীত করেছেন।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অধুনা রাজনীতির একটি বড় সমস্যা। এরিস্টটল স্থিতিশীলতা সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছেন, তা আজও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির চিরন্তন সম্পর্কের বিষয়ে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। এ সত্য উপলব্ধি করে এরিস্টটল বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে লাগামহীন অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দায়ী করেছেন। শুধু মার্কসীয় দৃষ্টিতে নয়, সমাজবিজ্ঞানের কোন লেখকই তাঁর এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের ধারণা এরিস্টটলকে যুগোত্তীর্ন করেছে।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শাসনের চেয়ে আইনের শাসনই যে উত্তম, এ ধরনের বক্তব্যের জন্য এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন। কারণ যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে বিধি সম্মত আইনের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্তি

আইন নৈব্যাক্তিক, নিরাশক্ত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুনিশ্চিত হতে পারে। আইন নৈব্যক্তিক, নিরাশক্ত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ ধারণার গোড়াপত্তন হয়েছে এরিস্টটলের হাতে।

- সীমিত সরকারের ধারণা এরিস্টটলের সৃষ্টি। আইনের সার্বভৌমত্বের কথা বলে এরিস্টটল নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ধারণার সূচনা করেছেন। যার মূল কথা হচ্ছে, সরকার ব্যবস্থা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারও আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাবের কথা বলে এরিস্টটল একজন অত্যাধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত কথা বলে গেছেন। কারণ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার সাথে দেশের জলবায়ু, ভৌগলিক ও প্রতিবেশের সম্পর্ক চিরন্তন। আধুনিক ভূ-রাজনীতিতত্ত্ব, ব্যবস্থাতত্ত্ব তাঁর কাছে ঋণী।
- এরিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ভেতর দিয়ে তিনি এ সংগঠনটির মহৎ উদ্দেশ্যের চিরন্তন বানী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনই হলো রাষ্ট্রের চরম ও পরম লক্ষ্য। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। রাষ্ট্র ছাড়া কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ন হতে পারে না, তাঁর এ বক্তব্যের কোন বিকল্প নাই। এ ভাবে তিনি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

তবে তাঁর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন, তার চিন্তার মধ্যে রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির প্রতিফলন, দাস ব্যবস্থাকে সমর্থন, রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে গুরুত্বহীন করা এ সব সীমাবদ্ধতা আছে। তারপরও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য এরিস্টটল হয়তো চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

সারকথাঃ

এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয় হিসেবে তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই, পুনযাচাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনিই অবতারণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আইনের শাসনের প্রবক্তা। এরিস্টটলই নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ধারণা র্সবপ্রথম দেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে তিনি ব্যাপক গবেষণা করে যে ফলাফল রেখে গিয়েছেন তা আজও আমরা ব্যবহার করে থাকি। রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় মানবীর সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মূল কৃতিত্ব এরিস্টটলের। এ সব অবদানের জন্য এরিস্টটল অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কারণ তিনি–
(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্য দিয়েছেন;
(খ) ব্যক্তির শাসনের চাইতে আইনের শাসনকে উত্তম বলেছেন;
(গ) ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপন করেন নি;
(ঘ) রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবতারণা করেছিলেন।

২। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এরিস্টটলের মতে শাসন ক্ষমতা থাকা উচিত
(ক) উচ্চবিত্তদের হাতে;
(খ) নিম্নবিত্তদের হাতে;
(গ) জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের হাতে;
(ঘ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে।

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক এরিস্টটলের মতে কেমন হওয়া উচিত?
(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে হতে হবে নীতিশাস্ত্রের অধীনস্থ;
(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিবে;
(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে;
(ঘ) নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধীনস্থ থাকবে।

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ।

রচনামূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। এরিস্টটলকে কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা হয়?
২। কেন এরিস্টটলকে আইনের শাসনের মূল প্রবক্তা বলা হয়?
৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ৬

এপিকিউরিয়ানবাদ ও ষ্টোয়িক দর্শন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ সুখবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন;
- ❑ ষ্টোয়িক দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হেলেনীয় যুগে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ খ্রী: পূ:)-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সুখবাদী মতবাদ। এই মতবাদের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে মানুষের জন্যে সবচেয়ে কল্যাণকর উপাদান হল 'আনন্দ' এবং জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে তা অর্জন করা। এপিকিউরীয়দের ধারণায় সুখ আসতে পারে যাবতীয় ভয়-ভীতি, বিশেষতঃ ঈশ্বর ভীতি, মৃত্যু ভয় ও পরকালের ভীতি ইত্যাদিকে জয় করার মাধ্যমে। তাদের দর্শনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে জগৎ-জীবন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে যাবতীয় ভয়-ভীতির উর্ধ্বে নিয়ে আসা। এপিকিউরীয় দর্শন অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রকৃতির। এই দার্শনিক মহলের প্রতিষ্ঠাতা এপিকিউরাস চেয়েছিলেন মানুষের সুখ ও সদ্‌গুণাবলীকে রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখতে। তিনি প্রচার করেন যে, ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের ধারণা কোন মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে না। এপিকিউরিয়ানবাদের দৃষ্টিতে রাজনীতিতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্থান নেই; যদি না তারা এ কাজের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ ধরণের জীবন জ্ঞানী ব্যক্তির স্পৃহা ও নীতিনিষ্ঠ অস্থিত্বের সাথে বেমানান এবং বোঝাস্বরূপ। এপিকিউরীয়রা যে-কোন ধরণের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়, যদি তা সমাজে সুখ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। এপিকিউরাসের 'বিজ্ঞ আত্ম-স্বার্থের' ধারণা সাংবিধানিক দক্ষ সরকার পরিচালনায় পরিপুরক। এ চিন্তার অনুসারীদের এটাও শিক্ষা দেয়া হয় যে 'সাংবিধানিক সরকার' এবং 'দক্ষ কর্তৃত্ববাদী' শাসনের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই।

এপিকিউরীয় দর্শনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই তারা যুক্তি উত্থাপন করতেন যে 'সুখী এবং বিলয়হীন' অতিন্দ্রিয় শক্তি হিসেবে মানুষের কাজকর্মে ঈশ্বরের তেমন কোন আগ্রহ নেই। এভাবে 'মৃত্যু ভয় ও ঈশ্বরের ক্রোধ' থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস চালায় এপিকিউরীয় দার্শনিকগণ। এপিকিউরাসের মতে, একজন ব্যক্তি তখনই মৃত্যুভয়কে জয় করতে পারে যখন সে আত্মার গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম। বস্তুবাদী চিন্তাধারার আলোকে তারা দাবি করেন যে, আত্মা হচ্ছে মানুষের সারা দেহে বিস্তৃত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ সাধনের সাথে সাথে মানুষের আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের বাইরে যেহেতু আত্মা বিরাজ করতে পারে না; এ জন্যেই মৃত্যুর পর কোন মরণোত্তর জীবনের সম্ভাবনা নেই। তাদের যুক্তিতে, মৃত্যু মানেই পুরোপুরিভাবে বিনাশ হয়ে যাওয়া।

নীতিশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত গুণাবলী তথা ন্যায়নীতি, সততা এবং আনন্দ-বেদনার মাঝে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় এপিকিউরীয় মতবাদে। এপিকিউরাস মনে করেন আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, পরিমার্জন ও বন্ধনমুক্তি মানুষকে প্রকৃত সুখের স্বাদ এনে দিতে পারে। বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতায় আস্থাশীল ছিলেন। এপিকিউরাস শিক্ষা প্রদান করেন - বিশাল মৃত্যু ভীতির হাত থেকে অবমুক্ত হয়ে মানুষ কতটা

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম। তাঁর মতে, 'মানুষ যা চায় তা হল সুখ এবং যা তারা বর্জন করতে চায় তা হল দুঃখ'। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য 'সুখ' ছাড়া অন্য কিছু নয়। যেহেতু উত্তম কোনকিছুর মাত্রাই হল সুখ, একটি সুখের চাইতে অপর সুখের মাত্রাগত তারতম্য হতে পারে, তা উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট হতে পারে না। এপিকিউরাস আরো দাবি করেন যে, মানুষের সকল উপলব্ধির শুরু এবং শেকড় হল 'উদরের সুখ'; এমনকি প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির সুখও এর সাথে জড়িত। এপিকিউরীয়রা এক্ষেত্রে যা দীক্ষা প্রদান করে তা হল "খাও দাও ফূর্তি কর, কিছুই না বহন কর।"

এপিকিউরীয় দর্শনকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কোন কোন বিশ্লেষক 'লাগামহীন' দর্শন বলে অভিহিত করেন। কেউ কেউ মনে করেন এই দর্শন ছিল অষ্টতায় ভরা। এসব সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বলা চলে এই দর্শন ছিল ধারাবাহিকতাপূর্ণ। ফলে তাদের সমকালীন ষ্টোয়িক দর্শনের তুলনায় ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আরো একটি জীবন্তড় দর্শন হিসেবে অক্ষুন্ন রয়েছে এপিকিউরীয় চিন্তাধারা। এই দর্শনের অনুসারীদের মাঝে গ্রিক ব্যাকরণবিদ এপোলোডারাস, রোমান কবি হোরাস, রাষ্ট্রনায়ক প্লিনি দ্য ইয়াংগার, কবি লুকরেটাস উল্লেখ্য। এপিকিউরীয় চিন্তাধারা চতুর্থ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক পিয়ারে গ্যসেন্ডির ছোঁয়ায় পুনর্জীবন ফিরে পায়। অতঃপর ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) এবং জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) এপিকিউরীয় মতবাদের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁদের উপযোগবাদী রাষ্ট্র দর্শন। এপিকিউরাসের দর্শনের সাথে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের মাঝে বিদ্যমান। উপরন্তু, এপিকিউরীয় মতবাদ অদ্যাবধি নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

ষ্টোয়িক দর্শন

এরিস্টটলীয় চিন্তাধারার পর হেলেনীয় যুগে ষ্টোয়িক দর্শন একটি সাড়া জাগানো মতবাদ হিসেবে বিকশিত হয়। এপিকিউরিয়ানবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এই মতবাদ এথেন্সের ষ্টোয়া নামক স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই মতবাদের প্রবর্তন সিনিকদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও এর গ্রিক স্থপতি এন্টিসথেনেস ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। তিন পর্বে বিকশিত হয় এই মতবাদ। প্রথম পর্যায়ে ৩০০-২০০ খ্রিঃ পূঃ। দ্বিতীয় পর্যায় ২০০-৫০ খ্রি. পূ. এবং তৃতীয় পর্যায় রোমান শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লেটো অনুসৃত ধারায় ষ্টোয়িক দর্শনের চারটি অন্তর্নিহিত গুণাবলী হল: প্রজ্ঞা, সাহস, ন্যায়নীতি ও মিতাচার। এপিকিউরিয়ানবাদের মত ষ্টোয়িক দর্শন ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী।

ষ্টোয়িক দর্শনের রয়েছে প্রধান তিনটি ধারা। যথা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিশ্বজনীনতাবাদ ও সামাজিক মতবাদ। এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি, ইচছার দিক থেকে সে স্বায়ত্বশাসিত, সে নিজেই তার আত্মার মনিব এবং ভাগ্যের নিয়ামক। ষ্টোয়িকদের কাছে সদ্‌গুণ আনন্দময় এবং বদ্‌গুণ অনিষ্টকর। সদ্‌গুণ এবং বদ্‌গুণ হল যথাক্রমে ইচ্ছার সঠিক ও ভ্রান্ত- বহি:প্রকাশ। ষ্টোয়িকদের মতে ব্যক্তি মানুষের এসব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিভাবে ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ভাবে তারা মতামত জ্ঞাপন করেন যে ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ তার নিজস্ব ক্ষমতার আওতাধীন। ষ্টোয়িকদের ধারণা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেবল তার ইচছার সঠিক দিকটির প্রতিফলন ঘটাবেন।

জীবনের তাৎপর্যকে ষ্টোয়িকরা প্রকৃতিগতভাবে দু'ভাবে উপস্থাপন করেন। প্রথমত: ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী সাধারণ বাসনাগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে পূরণ করতে তৎপর হবে। দ্বিতীয়ত: একই মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সে অপরাপর সদস্যের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। ষ্টোয়িকরা আরো মনে করত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্যদের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় প্রকৃতি প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী।

একজন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে যুক্তির অধীনে কাজ করে এবং যুক্তি হল ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ যার ফলাফল তার মন:পুত না হলেও একে সে সমর্থন করে। একজন যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে সে জানে সদ্‌গুণ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং তার জীবনে যা কিছু ঘটছে তা প্রকৃতির শাশ্বত বিধান অনুযায়ী ঘটে চলেছে।

মানুষের যুক্তিশীল চিন্তার প্রতি ষ্টোয়িকদের ছিল প্রগাঢ় আস্থা। তারা মনে করত ঈশ্বর যুক্তিশীল এবং মানুষও যুক্তিশীল। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং সে হিসেবে প্রতিটি মানুষ একে অপরের ভাই-বোন। যেহেতু মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত, সে হিসেবে তারা সবাই সমান। এ ভাবে ষ্টোয়িকদের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী হল একটি বিশ্ব রাষ্ট্র। এখানে ঈশ্বর ও মনুষ্যকূল সবাই এর নাগরিক এবং এখানে রয়েছে সত্যিকারের যুক্তিশীল সংবিধান, যা মানুষকে কোন্ কাজটি করণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয় তা শিক্ষা দেয়। এখানে সঠিক যুক্তি হল প্রকৃতির আইন, ঈশ্বরের বিধান যার নীতিমালা, শাসক-প্রজা নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য।

ষ্টোয়িকদের মতে, প্রতিটি মানুষের জন্য দু'ধরণের আইন রয়েছে। প্রথমত: তার নগরীর আইন বা রীতি-নীতি; দ্বিতীয়ত: বিশ্ব-নগরের আইন তথা যুক্তির আইন। এ দু'টো আইনের মধ্যে দ্বিতীয়টির বৃহত্তর ক্ষমতা থাকা চাই; এবং এর ভিত্তিতেই রচিত হবে নগরীর শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধান, প্রথা ও রীতি-নীতি। নগরীর রীতি-নীতি বহুবিধ হলেও যুক্তি এক। সেদিক থেকে রীতি-নীতির কাজ হবে যুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া। এ ভাবে ষ্টোয়িক মতবাদকে দেখা হয় বিশ্ব-বিস্তৃত একটি বিধি ব্যবস্থা হিসেবে যার রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। এ মতবাদ ব্যক্তির সামাজিক স্বাতন্ত্রের গুরুত্বকে পরিহার করে রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সমঝোতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালায়। এভাবে ষ্টোয়িক দর্শন বিশ্বজনীন মতবাদ থেকে মানবতাবাদে পরিণত হয়। অবশ্য, ষ্টোয়িকরা প্রচলিত দাসপ্রথার বিরোধিতা করে নি। তাদের ধারণা, মানুষের বাইরের পদমর্যাদার চেয়ে তার ভেতরের মানুষটির গুরুত্বই অধিক।

রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে ষ্টোয়িক দর্শন এক গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মতবাদ প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে যা পরবর্তীতে রোমান জুরিসপ্রুডেন্সের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রতত্ত্বে খ্রিষ্টিয় মতবাদ, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক চিন্তাধারা বহুলাংশে ষ্টোয়িক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সারকথা

এপিকিউরিয়ানবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যক্তি জীবনের জন্য সর্বময় সুখের অনুসন্ধান। তাদের মতে, যা-কিছুই সুখ বা আনন্দদায়ক তা-ই 'ভালো', আর যা দুঃখ দেয় তা-ই 'মন্দ'। যাবতীয় অকল্যাণ ও ভয়-ভীতির শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিকে অবমুক্ত করে স্বাধীন আনন্দ চর্চাই তাদের লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে আনন্দ-উপভোগ যাতে লাগামহীন হয়ে না পড়ে সেজন্যে ন্যায়নীতি, সততা ও আনন্দ-বেদনার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করার পরামর্শ রয়েছে এই মতাদর্শে। ষ্টোয়িক দর্শন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের সমতার বাণীকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে। 'বিশ্ব নাগরিকত্বের' ধারণা ষ্টোয়িকদের সৃষ্টি। মানুষের মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং বিশ্ব সরকারের ধারণা প্রচার ষ্টোয়িক দর্শনের মৌলিক অবদান। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গুরত্বারোপের মাধ্যমে এই মতবাদ রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে আজো সমুজ্জল হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এপিকিউরিয়ানবাদ কোন্ ধরণের মতবাদপুষ্ট?
(ক) এপিকিউরিয়ানবাদ গণতন্ত্রের সমর্থক;
(খ) এটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে সমর্থন করে;
(গ) এটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উৎসাহিত করে;
(ঘ) এটি নৈরাজ্যবাদী ভাবধারাকে সমর্থন যোগায়।

২। ষ্টোয়িক দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তি কিসের প্রভাবে কাজ করে?
(ক) ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রভাবে কাজ করে থাকে;
(খ) পুলিশী নির্যাতন ও হয়রানির ভয়ে কর্মতৎপর হয়;
(গ) প্রকৃতিগতভাবে যুক্তির অধীনে কাজ করে থাকে;
(ঘ) রুটি-রোজির প্রয়োজনে কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

এপিকিউরিয়ানবাদে মানুষের জীবনের একান্তড় উদ্দেশ্য কি?
ষ্টোয়িক দর্শন কোথায় কখন বিকশিত হয়?
এপিকিউরিয়ানবাদের সাথে ষ্টোয়িক দর্শনের মৌলিক পার্থক্য কি?
'দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন' প্রবাদটি ষ্টোয়িক দর্শনের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এপিকিউরিয়ানবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২। ষ্টোয়িক দর্শনের প্রধান ধারাসমূহ বর্ণনা করুন।

ঠিক উত্তর : ১। গ, ২। ঘ

পাঠ - ৭

রোমান রাষ্ট্রচিন্তা : পলিবিয়াস ও সিসেরো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ পলিবিয়াসের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ❑ সিসেরোর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ঐতিহাসিক পলিবিয়াস (২০০-১২০ খ্রী: পূ:) তাঁর লেখা গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব রোম' রচনার মাধ্যমে বিশ্বে খ্যাতিমান হয়ে আছেন। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং থুসিডাইডস্ এর পরই তাঁর অবদান স্বীকৃত। তিনি আর্কেডিয়া নগর রাষ্ট্রের অন্তর্গত মেগালোপলিস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল প্রশাসক হিসেবে নগর রাষ্ট্রসমূহের কনফেডারেশন আচেনাস-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

মেসিডোনিয়ায় রোমান আক্রমণ ও বিজয়ের পর একজন সম্ভ্রান্ত আচেয়ান হিসেবে অপরাপর হাজারো বন্দীদের সাথে পলিবিয়াস খ্রি. পূ. ১৬৮ সালে যুদ্ধবন্দী হন। আচেয়ান লীগের নেতা হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বন্দী অবস্থায় রোমে স্থানান্তর করা হয়। রোমে অবশ্য পলিবিয়াসের আশ্রয় মিলে জেনারেল আমেলাস পাওলাসের গৃহে তাঁরই দুই পুত্র সন্তানের গৃহ শিক্ষক হিসেবে। তন্মধ্যে অনুজ ছাত্র স্কিপিও শীঘ্রই ইটালীর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ লাভ করলে পলিবিয়াসের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন। ষোল বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর রোমান সিনেট (১৫১ খ্রিঃ পূঃ) জীবিত আচিয়ানদের গ্রীসে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করলে পলিবিয়াস তাঁর বন্ধুপ্রতিম ছাত্র স্কিপিও-র সান্নিধ্যে রয়ে যান। স্কিপিও পরিচালিত আফ্রিকা অভিযানে পলিবিয়াস তাঁর সঙ্গী হন এবং খ্রিঃ পূঃ ১৪৬ সালে কার্থেজের পতন ও পোনিক যুদ্ধের সমাপ্তি প্রত্যক্ষ করেন।

রোমান রাষ্ট্রনায়কদের সাহচর্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তি এবং পলিবিয়াসের নিজস্ব প্রশাসনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা তাঁদের কাছে স্বীকৃত ও সমাদৃত হবার ফলে পলিবিয়াস রোম ও আচেনাসের মধ্যেকার সমঝোতা স্থাপন মিশনের দায়িত্ব নিয়ে গ্রীসে গমনের সুযোগলাভ করেন। যদিও এই মিশনটি সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়, তথাপি তিনি গ্রীসের পুনর্গঠনে রোমান সরকারের প্রতিনিধিত্বের সুযোগপ্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও তিনি 'রোমানদের' পক্ষে ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন সামরিক ও কূটনৈতিক মিশনে অংশগ্রহণ করেন।

পলিবিয়াসের পান্ডিত্যপূর্ণ বাস্তব জ্ঞানের প্রতিফলন পাওয়া যায় চল্লিশ খন্ডে সমাপ্ত তাঁর লেখা 'হিস্ট্রি অব রোম' গ্রন্থে। গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পটভূমি এবং রোমান রাজনীতি ও প্রশাসনের সাথে তাঁর দীর্ঘকালীন সংশ্রব উভয়ের সমন্বয়ে প্রথমবারের মত তাঁকে রোমান সাম্রাজ্যের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র থেকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার যুগ সন্ধিক্ষণে (২৬৪-১৪৬ খ্রিঃ পূঃ) যেসব রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয় সবকিছুই উঠে আসে তাঁর ইতিহাস রচনায়। বিশেষতঃ পোনিক যুদ্ধের সময় থেকে মেডিসন বিজয় পর্যন্ত তেপ্পান্ন বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস আপন অভিজ্ঞতায় ব্যাখ্যা করেন তিনি। কেন এবং কিভাবে পৃথিবীর সভ্যজাতিসমূহ একের পর এক রোমান শাসনের পতাকাতলে বিলীন হয়ে যায় সেই শৌর্য-বীর্যের কাহিনী স্থান পায় এই গ্রন্থে।

'হিষ্ট্রি অব রোম' গ্রন্থে পলিবিয়াস সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এদের প্রকৃতিগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করেন। প্লেটো এবং এরিস্টটলের অনুসরণে পলিবিয়াস সরকারের ত্রি-মাত্রিক শ্রেণীবিভাগ তুলে ধরেন। যেমন: স্বাভাবিক অবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র এবং এদের অধঃপতিত অবস্থায় যথাক্রমে স্বেচ্ছাতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র এবং হুজুগতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে এরিষ্টটলের চাইতেও তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে এ সব সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এর অধঃপতনের বীজ রোপিত হয় সেই সরকার ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই। পলিবিয়াস এটাও বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভাল উপাদানগুলো যদি একত্র কোন সরকার ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায় তা'হলে সেটি সরকারের অস্থিতিশীলতা কাটিয়ে স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়ক হবে। স্পার্টা এবং রোমের উদাহরণ টেনে পলিবিয়াস তার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

রোমের সাংবিধানিক নীতিমালার উল্লেখ করে পলিবিয়াস উল্লেখ করেন যে, এখানে কনসালদের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের নীতিমালা, সিনেটের মাধ্যমে অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব এবং জনপ্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটানো হয় এবং সরকারের প্রতিটি কাঠামো একে অপরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরে একপ্রকার ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ভাবে পলিবিয়াসই হলেন প্রথম লেখক যিনি মিশ্র সরকার ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো মতামত জ্ঞাপন করেন।

একজন ইতিহাসবেত্তা হিসেবে কেবলমাত্র ইতিহাসের ঘটনা ও দিন-তারিখ লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বরং সেগুলোর রাজনৈতিক পটভূমির অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ ও সেসবের ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। তাঁর লেখার পদ্ধতি সাধারণ অথচ উপস্থাপনা সাবলীল এবং পরিচ্ছন্ন। এটিক ভাষায় লেখা গ্রীক রাজনৈতিক সাহিত্যে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল এটি। পলিবিয়াস হলেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি রাজনীতি পাঠে 'প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি' ব্যবহার করেন এবং পরীক্ষা করে দেখান যে একটি রাষ্ট্রের সাবলীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সক্ষম। রোমের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তার অমিত ঐশ্বর্য বয়ে আনার পেছনে কতটা অবদান রেখেছে সেটিও তিনি পরীক্ষা করে দেখান। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছু মিলিয়ে তাঁর ইতিহাস রচনাকে কেবলমাত্র ইতিহাসের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখে নি।

সিসেরো

প্রাচীন রোমান যুগের প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক ও সুবক্তা মার্কাস টালিয়াস সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রী: পূ:) বর্তমান ইটালীর আর্পিনো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে তিনি টালি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। যৌবনে তিনি আইন , বাগ্মিতা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়াদি অধ্যায়ন করেন। সংক্ষিপ্ত সময় সামরিক বিভাগের চাকুরী এবং তিন বছরের আইন পেশায় অভিজ্ঞতা ছাড়া গ্রীস ও এশিয়া ভ্রমণকালে তিনি পাঠাভ্যাস অব্যাহত রাখেন। তিনি ৭৭খ্রি: পূ: রোমে প্রত্যাবর্তন করে রাজনৈতিক পেশা শুরু করেন। এবং ৭৪ খ্রি: পূর্বাব্দে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

সিসেরো নিজে অভিজাত পরিবারভুক্ত না হয়েও তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির কারণে ৬৪ খ্রী: পূর্বাব্দে কনসালশিপ নির্বাচনে অধিকাংশ বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী রোমনদের সমর্থনে বিজয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেটলিন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে সিসেরো প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কিছু সদস্যকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার অভিযোগে সিসেরোকে মিসেডোনিয়ায় নির্বাসনে যেতে হয়। তাঁর নির্বাসনের এক বছরের মাথায় রোমান নরপতি জেনারেল পম্পেই'র সরকারে যোগদান করেন। পম্পেই'র সাথে তখন জুলিয়াস সিজারের

চলছিল ঘোর শত্রুতা। ৪৮ খ্রী: পূর্বাব্দে সিজারের কাছে পম্পেইর পরাজয়ের পর সিসেরো একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন শুরু করেন এবং প্রচুর লেখালেখির কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ৪৪ খ্রী: পূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের পালক পুত্র সম্রাট অগাস্টাসকে মার্ক এন্টানির সাথে ক্ষমতার লড়াই-এ সমর্থন করেন। পরবর্তীতে অগাস্টাস ও এন্টোনিওর মাঝে সমঝোতা স্থাপিত হলে ৪৩ খ্রী: পূর্বাব্দে সিসোরোকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে আত্মাহুতি দিতে হয়।

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সিসেরো ছিলেন একজন চমকপ্রদ লেখক ও দার্শনিক। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন : কবিতা, বাগ্মিতা, বাগাড়ম্বরতা, নীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর লেখার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্বদেশের মানুষকে গ্রীসের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের ধ্যান ধারণার সাথে পরিচয় ঘটানো এবং সেগুলো কিভাবে রোমানদের জীবন যাত্রায় প্রযোজ্য হতে পারে তা তুলে ধরা। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ষ্টোয়িকদের দ্বারা এতোই প্রভাবিত হয়েছিল যে তিনি পুরোপুরিভাবে ষ্টোয়িক দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সিসেরোর রাজনৈতিক লেখাগুলো প্লেটো এবং এরিস্টটলের চিন্তাধারার কাছাকাছি হলেও তাঁর লেখায় রয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে 'অধিকতর ব্যতিক্রম ও সজীবতা'। প্লেটো এবং এরিস্টটল যেখানে নগর রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের চিন্তাকে সম্প্রসারিত করতে পারেন নি সিসেরো সেখানে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের আলোচনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যান। প্লেটো এবং এরিস্টটলের লেখায় গ্রীকদের জাতিগত উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রীকদের 'বর্বর' হিসেবে দেখার অবকাশ থাকলেও সিসেরো রোমের রাজনৈতিকও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়ে তোলেন। সিসেরো তার 'ডি রিপাবলিকা' গ্রন্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্ভব, সরকারের শ্রেণীবিভাগ এবং এর শাখাসমূহ দ্বারা কিভাবে, ন্যায়বিচার পরিচালনা করা যায় ইত্যাদি বিষয়াদি আলোচনা করেন। প্লেটোর ল'জ গন্থের সাথে সাজুজ্যপূর্ণ 'ডি লেগিবাস' গ্রন্থের মাধ্যমে সিসেরো রোমান আইন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সিসেরো বলেন, রাষ্ট্র কেবলমাত্র জনগণের সংঘবদ্ধ প্রয়াস নয় বরং এটি সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্য আইনের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনের এক সমবেত প্রচেষ্টা। রাষ্ট্র টিকে থাকে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সিসেরোর মতে, আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সম্প্রদায় হিসবে চিহ্নিত করা কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে একটি নৈতিক সমষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং এটি যদি নৈতিক ও আদর্শগত বন্ধন দ্বারা যুক্ত না থাকে তা হলে তা রাষ্ট্র না বরং রাজপথে মারাত্মক ডাকাতির' মত ঘটনায় পরিণত হয়। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র যদি একনায়ক কর্তৃক কঠোর আইন দ্বারাও শাসিত হয় রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রয়োজনে নৈতিক আইনকে অব্যাহত রাখতে হবে। সিসেরোর মতে মানুষ রাষ্ট্র গড়ার পেছনে একতাবদ্ধ হয় তাদের প্রকৃতির দূর্বলতার জন্যে নয় বরং প্রকৃতিগত সান্নিধ্যের কারণে।

সিসেরোর মতে, রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে হলে তার জন্য প্রয়োজন সরকারী ক্ষমতার-বন্টনের পরিকল্পনা। সরকার নির্দেশনা দায়িত্ব একজনের হাতে থাকতে পারে এবং সে সুবাধে এটি স্বাভাবিক অবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রর বা গণতন্ত্র হতে পারে। এরিস্টটলের মতোই সিসেরো মনে করতেন শাসকরা আত্মস্বার্থে অথবা জনগণের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালনা করবে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি ন্যায়নীতির মাপকাঠি নির্ধারণ করেন। সিসেরো সরকারের ত্রিমাত্রিক শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রকে

উত্তম বলে মনে করেন। তবে তিনি এটাও মনে করেন যে, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্যপূর্ণ চতুর্থ ধাঁচের রিপাবলিক সরকার হবে সর্বোত্তম।

সিসোরো রচিত 'ডি রিপাবলিকা' গ্রন্থটি ছিল ন্যায়নীতির পক্ষে একটি বলিষ্ঠ দলিল। এ গ্রন্থের বেশিরভাগ স্থান জুড়েই বিস্তৃত রয়েছে ন্যায়নীতির আলোচনা। তাঁর মতে সত্যিকারের আইন হল প্রাকৃতিক আইন যা যুক্তিশীল চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধরনের আইন সব যুগের সকল মানুষকে আকৃষ্ট করে। আইন সর্বত্রই এক প্রকার, অপরিবর্তনশীল এবং সব জাতির সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রকৃতির আইন তথা পরমার্থিক আইনের ধারণাকে বিকশিত করার মাধ্যমে সিসেরো প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানাদিতে বিশুদ্ধ যুক্তিশীলতার উপাদান সন্ধান করেন। এ ধরনের আইনকে সিসেরো সভ্য জীবনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন। প্রাকৃতিক আইনকে দেশের জন্য ইতিবাচক বলে চিহ্নিত করে তিনি বলেন এগুলোর আইন যেহেতু উচ্চমার্গীয় যুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য এর বাস্তবায়নের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। সিসেরোর এই দর্শন প্রাথমিক যুগের গীর্জা ও মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টিয় ভাবধারার উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্লেটো এবং এরিষ্টটলের অসমতার ধারাকে খন্ডন করে সিসেরো মানুষের সমতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের সমতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সিসেরো জানান মানুষ শিক্ষা দীক্ষা অথবা সম্পদের দিক থেকে অসমান হলেও মনস্তাত্বিক দিক থেকে তথা যুক্তিশীল চিন্তার অধিকারী হিসেবে প্রত্যেকেই সমান। তার মতে, ভ্রান্ত পদক্ষেপ, বদ গুণাবলী, মিথ্যাচার মানুষের মধ্যে অসমতা তৈরি করে। সিসেরো এরিষ্টটলের মত বর্ণগত বৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে সব মানুষ টিকে থাকার জন্য সমান সামর্থ্য ধারন করে এবং সব ধরনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই তাঁরা ভাল মন্দের প্রকারভেদ নির্ণয় করতে সক্ষম। সিসেরোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার অপর উল্লেখ্যযোগ্য দিকটি হল উত্তম সরকারের ভিত্তি হিসেবে জনগণের সম্মতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা। সিসেরোর মতে জনগণের এই ক্ষমতার স্বীকৃতি ছাড়া স্বাধীনতার কোন অর্থ হতে পারে না। তাঁর মতে, স্বাধীনতার চাইতে সুন্দর আর কিছু নেই; এর মাত্রা সবার জন্য এক ও অভিন্ন। মোটকথা, সিসেরোর স্বাধীনতা বিষয়টিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রথমত: স্বাধীনতা সকল নাগরিককে তাদের শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে দেয়া প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত: জনগণের সম্মতিকে বৈধ সরকারের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ভাবে সম্মতির প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি যা কিনা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন লকের চিন্তাধারায় গুরুত্বের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সারকথা

ঐতিহাসিক পলিবিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান বিষয়ক রাজনৈতিক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ লেখনীতে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র থেকে রোম কিভাবে একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যে পরিণত হয় তা বিধৃত হয়েছে। রোমের এই অসামান্য সাফল্যের পেছনে এর মিশ্র সরকার ব্যবস্থা, ক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির অবদানকে তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যের সাথে ব্যাখ্যা করেন।

সিসেরো প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার ভিতকে খন্ডনের মাধ্যমে মানুষের সমতা ও স্বাধীনতার ধারণাকে সম্প্রসারিত করে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের যুক্তিশীল চিন্তানির্ভর ন্যায়বিচার ধারণা তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনি নৈতিককতা ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেন। মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম চিন্তাবিদ। তাঁর দর্শন নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, আইনশাস্ত্র ও রাজনীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এখানেই তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পলিবিয়াস কোথাকার নাগরিক ছিলেন?
(ক) স্পার্টা;
(খ) আর্কেডিয়া;
(গ) রোম;
(ঘ) এথেন্স।

২। সিসোরো কোন দেশের মানুষ ছিলেন।
(ক) ভারতবর্ষের;
(খ) চীন দেশের;
(গ) রোম দেশের;
(ঘ) ইতালীর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পলিবিয়াস প্রণীত সরকারের শ্রেণীবিভাগ কি?
২। ক্ষমতার ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পলিবিয়াসের মতামত কি ছিল?
৩। সিসোরো কি জন্য বিখ্যাত ?
৪। ন্যায়বিচার অর্থে সিসেরো কি বুঝাতে চেষ্টা করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে পলিবিয়াসের খ্যাতির কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২। সিসোরোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান দিকগুলো আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : ১। খ, ২। গ

৪

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা: রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। এগুলো হল প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা। মধ্যযুগ আপন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। মধ্যযুগের সূচনাকাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে টিউটোনিক উপজাতিদের দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত এ যুগ বিস্তৃত ছিল। হার্নশ একাদশ শতাব্দীর গ্রেগরীয় আন্দোলন থেকে প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন পর্যন্ত মধ্যযুগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যযুগের নতুন ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা শ্রেণীর মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিবাদ দ্বারা এ যুগ তাৎপর্যমন্ডিত। অধ্যাপক ডানিং যথার্থই বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইতিহাসের মূল বিষয় হচ্ছে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

আসুন আমরা মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা শীর্ষক ইউনিটের পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ : মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য;*
- *পাঠ-২ : সেন্ট অগাষ্টিন;*
- *পাঠ-৩ : টমাস একুইনাস ও*
- *পাঠ-৪: পাদুয়া মারসিলিও।*

পাঠ-১

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বৈশিষ্ট্যঃ-

- **ধর্ম বিশ্বাসঃ** মধ্যযুগে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে ধর্ম বিশ্বাস ছিল মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। রাষ্ট্রচিন্তা গভীরভাবে খ্রিষ্ট ধর্মের মূলনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। চার্চ ও রাষ্ট্র ছিল এক ও অভিন্ন। গির্জার পুরোহিতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন ধর্মের ধারক ও বাহক। কোন সৃজনশীল, স্বাধীন ও স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা মধ্যযুগে গড়ে উঠে নি। গির্জাই ছিল যাবতীয় জ্ঞানের রক্ষক ও প্রচারক। পুরোহিততন্ত্রের উত্থান মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অধ্যাপক স্যাবাইন বলেন "Christianity was a doctrine of salvation"
- **বিশ্বজনীনতাবাদঃ** মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য হল তার বিশ্বজনীনতাবাদ। রোমানরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের সাম্রাজ্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ফল। অতত্রব তা সার্বজনীন ও শ্বাশত। খ্রিষ্টধর্ম এই গভীর বিশ্বাসের প্রতি জোরালো সমর্থন দিয়েছিল। সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর এই ধর্ম সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে গির্জা একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ বিশ্বজনিন সমাজের একটি রূপ হল সাম্রাজ্য এবং অন্যরূপ হল চার্চ।
- **রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে বিরোধঃ** মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যকার বিরোধ ও সংঘর্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিরোধ বিদ্যমান ছিল। ফলে ধর্ম ও রাজনীতি কোনটাই সঠিক পথে পরিচালিত হয় নি। ওয়ানলাস বলেন, "মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন গির্জা ও রাষ্ট্র শক্তির আধিপত্য বিস্তারের বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।" রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সম্রাট এবং গির্জার প্রধান হিসেবে পোপ-এই দুই কর্তৃত্বের বিরোধের মধ্যে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপে গীর্জার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। গির্জার প্রভাব বৃদ্ধি ও হ্রাস দু'টোই ঘটেছিল মধ্যযুগে। এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোপ তাঁর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে পোপের প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পেতে থাকে।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে ছিল না।

- **অরাজনৈতিকঃ** মধ্যযুগ ছিল মূলত অরাজনৈতিক। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধ্যাপক গেটেলের মতে,"রোমান আইনশাস্ত্রের প্রসারের কথা বাদ দিলে গ্রীক নগর রাষ্ট্রের পতনের পর থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র দর্শন ছিল অরাজনৈতিক ধরনের। অধ্যাপক ডানিং বলেন " The middle age was unpolitical. lts aspirations and ideals centered around the form and content of religious belief."এ যুগের আশা-আকাঙ্খা ও মতাদর্শ ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মুক্তচিন্তার অভাবে রাজনৈতিক দর্শন ধর্মীয় চেতনা ও ন্যায় শাস্ত্রের গভীর গহবরে বন্দি ছিল। মধ্যযুগে রাষ্টচিন্তা ছিল, কিন্ত রাষ্ট্রতত্ত্ব ছিল না। রাজনৈতিক বিষয়াদির ব্যাপারে মধ্যযুগ গভীরভাবে মনোনিবেশ করেনি। জনগণ নিজেদেরকে মূলত: ঐশ্বরিক চিন্তা-

ভাবনায় নিয়োজিত রাখত। খ্রিষ্টীয় চিন্তাবিদদের ধারণায় মানব সমাজে দ্বৈতসংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে আত্মিক এবং অপরটি জাগতিক। গির্জা এবং পুরোহিতগণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতো। অপরদিকে সম্রাট রাজনৈতিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতো।

- **শোষণের ইতিহাস:** মধ্যযুগের ইতিহাসকে দীর্ঘ শোষণের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজের বিকাশের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। যাজকেরা পাপ-পূণ্য ও পরলোকের ভয়ের কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ ও আনুগত্য আদায় করত। বিদ্যমান আর্থ-সামজিক ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে।

মধ্যযুগে সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতীক ছিল রাজা

- **সামন্তবাদ:** মধ্যযুগে রাজা ও গির্জার মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে, ঠিক সে সময় উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের। সামন্তবাদ এক ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার কেন্দ্র ছিল ভূমি। ভূমিভিত্তিক ক্ষমতা, অধিকার ও সুবিধা প্রভৃতি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের শাসক বলতে সামন্ত প্রভুদের বোঝাতো। অধ্যাপক ডানিং উল্লেখ করেন, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে গির্জা বনাম রাষ্ট্র, অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।
- **রাজতন্ত্রের বিকাশ:** রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রায় সমার্থক ছিল। হার্নশ এর মতে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের চুক্তির গোড়াপত্তন হয় মধ্যযুগে। জনগণ তখন ধারণা পোষণ করতো যে, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত তাই তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করতে পারেন না।
- **সুসংগঠিত রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি:** মধ্যযুগে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। এই যুগের শেষের দিকে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে রাষ্ট্রের প্রভাব খুব ব্যাপক ভিত্তিক ছিল না।
- **সাম্রাজ্য:** মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর তাদের আইনী কাঠামো ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে ভাটা পড়লেও মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্টার চিন্তা ও ধারাবাহিকতা ছিল একটি বাস্তব সত্য।
- **অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রচিন্তা:** অনেকের মতে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল অবৈজ্ঞানিক। তবে আধুনিক বিচারে কোনক্রমেই তা গুরুত্বহীন ছিল না। মধ্যযুগের সংঘাতময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভর করেই আধুনিক যুগের আগমন ঘটেছে। মধ্যযুগের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল হচ্ছে আধুনিক ইউরোপ।

সারকথা:

মধ্যযুগে ধর্ম বিশ্বাস ছিল মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। রাজনীতি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে সমাজ বিকাশের গতি ছিল মন্থর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু ছিল ভূমি। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা গির্জা ও সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মধ্যযুগে মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কি ছিল?
(ক) রাজতন্ত্র; (খ) পোপ;
(গ) ক্ষমতা; (ঘ) ধর্ম বিশ্বাস।

২। "Christianity was a doctrine of salvation" এই বক্তব্যটি কার?
(ক) টমাস একুইনাস; (খ) সেন্ট অগাষ্টিন;
(গ) অধ্যাপক স্যাবাইন; (ঘ) অধ্যাপক ডানিং।

৩। 'The middle age was unpolitical' এই উক্তিটি কার?
(ক) কনষ্ট্রানটাইন; (খ) অধ্যাপক ডানিং;
(গ) অধ্যাপক গেটেল; (ঘ) অধ্যাপক স্যাবাইন।

৪। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে কোন শতাব্দীতে?
(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে; (খ) এয়োদশ শতাব্দীতে;
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে; (ঘ) চতুর্থদশ শতাব্দীতে।

উত্তরমালা ঃ- ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। মধ্যযুগে গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন ছিল?

২। অধ্যাপক ডানিং মধ্যযুগ সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ)

এ পাঠটি শেষে আপনি-

- ❑ সেন্ট অগাষ্টিন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ অগাষ্টিনের চিন্তাধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তাজগতে সেন্ট অগাষ্টিন একটি বিশিষ্ট নাম। মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। বিশ্ব ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে ৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার নুমিদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন নিঃধর্ম গোষ্ঠীয় প্যাগান (Pagan) এবং মাতা ছিলেন একজন গোঁড়া খ্রিষ্টান। তাঁর মাতার কাছ থেকেই তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। বাল্যকালে অগাষ্টিন তাঁর গুরু সেন্ট এমব্রোসের (Ambrose) সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেন। স্বল্পকালের মধ্যে তিনি তাঁর সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা গুরুর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর অসাধারণ ধর্মজ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য তিনি উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো নামক স্থানের ধর্মযাজকের পদ অলংকৃত করেন। ৪৩০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অগাষ্টিনের চিন্তার উল্লেখযোগ্য দিক হল খ্রিষ্টান কমনওয়েলথ সম্পর্কে ধারণা। কমনওয়েলথকে তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের চরম রূপ বলে গণ্য করেছেন। খ্রিষ্টান কমনওয়েলথের ধারণা শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক যুগেও ব্যপ্তি লাভ করেছে। সেন্ট অগাষ্টিনের রচনাবলীর মধ্যে *(The city of God)* অর্থাৎ *'ঈশ্বরের নগরী'* হচ্ছে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অগাষ্টিনের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। তাঁর এই রচনা সমগ্র মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এটি ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ। তাঁর মতে সমগ্র মানব সমাজ এই নগরীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সময়ে তিনি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। রাষ্ট্রচিন্তায় মধ্যযুগীয় যে স্রোত ধারা প্রবাহিত হয় তার গতিসীমা বহুলাংশে তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক স্যাবাইন যথার্থই বলেছেন, তাঁর রচনাগুলো ছিল চিন্তার খনি বিশেষ যা থেকে পরবর্তীকালে ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট চিন্তাবিদ ও লেখকগণ মনিমুক্তা আহরণ করেছেন। তাঁর "*The city of God*" গ্রন্থটি প্রত্যেকের নিকট ছিল একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইতিহাসের এক সংকটকালে লিখিত হয়েছিল এ গ্রন্থটি। কতকগুলো নির্দিষ্ট চিন্তার সন্ধান এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। *'সিটি অব গড'* এর মধ্যে আমরা মধ্যযুগের একটা সুন্দর চিত্র পাই। সেন্ট অগাষ্টিনের চিন্তাধারার মূলে ছিল রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয়। তাঁর সময় রোমান সভ্যতা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। রোমান সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর বহিরাগত জাতিগুলো এসে রোমান সভ্যতা ও খ্রিষ্ট ধর্মের উপর চরম আঘাত হানে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে চরম সংকট দেখা দেয়। রাজনীতিক অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য সর্বত্র বিরাজ করতে শুরু করে। গির্জা ও রাজশক্তির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ ও সংকটকে আরো ঘনিভূত করে তুলেছিলো। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য খ্রিষ্টান ও বহু প্যাগানরা পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকে। বহু প্যাগানদের উত্থান এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব হ্রাস তাঁকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি রোমের পতনকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন বলে মনে করেন। তিনি প্যাগানদের আক্রমণ থেকে খ্রিষ্টধর্ম রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।

অগাষ্টিনের ঈশ্বরের নগরী একটি বিমূর্ত ধারণা।

অগাষ্টিন রাষ্ট্র ও খ্রিষ্টধর্মকে পাশাপাশি রাখেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে মান্য করার প্রধান কারণ হল এই যে, রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার পেছনে ঐশ্বরিক এক পরিকল্পনা থাকে যা তার কার্যকলাপকে ধর্মীয় লক্ষে পৌছাতে সহায়তা করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রকে মান্য করার আর একটি কারণ হল রাষ্ট্র শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্পত্তি রক্ষা করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য এমন হওয়া প্রয়োজন যা স্রষ্টার বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের কোন আইন ইশ্বরের আইনের বিরোধি হলে নাগরিকগণ সে আইন মানবে না। অগাষ্টিন ধর্মতত্ত্ব ও খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জোরালোভাবে বলেন যে, রোমান সাম্রজ্যের পতনের জন্য কোন ক্রমেই খ্রিষ্টধর্ম দায়ী নয়। তিনি বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, কোন দেবতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অথবা আর্শিবাদ বা অভিশাপের কারণে কোন সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে পারে না। তাঁর গ্রন্থ *'সিটি অব গড'* এ তিনি দার্শনিক তত্ত্ব ও ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। *'সিটি অব গডের'* চমকপ্রদ বিষয় হল দুই শহরের কাহিনী। একটি শহরের অবস্থান স্বর্গে, অন্যটি পৃথিবীতে । মানুষের দু'টি সত্তা যেমন দেহ ও আত্মা, এই দুই রাজ্যের প্রতীক। প্রতিটি মানুষ উভয় রাজ্যের নাগরিক।

স্বর্গরাজ্য আত্মার এবং প্রার্থিব রাজ্য দেহের

স্বর্গরাজ্য হল সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহত্বের সাম্রাজ্য। বিধাতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য এবং স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি হল এর বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রাজ্য লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, নীচতা ও হিংসায় ভরপুর। এই রাষ্ট্র অস্থায়ী, কিন্তু স্বর্গরাজ্য চিরস্থায়ী। পার্থিব রাজ্য অন্ধকার, মোহ, ক্ষমতালিপ্সা, আত্মপ্রীতি, কালিমা ও কামনায় আচ্ছন্ন। অন্যদিকে স্বর্গরাজ্য জ্যোর্তিময়, চিরভাস্বর প্রেম-প্রীতি, আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক শক্তির জগত। পরিপূর্ণ আলোর জন্য এটা হচ্ছে অনাবিল শান্তির জগত। সেন্ট অগাষ্টিন বলেন যে, ন্যায়নীতি ও শান্তি হল স্বর্গরাজ্যের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ন্যায়নীতি ও শান্তির আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থায়। ন্যায়নীতি হল সেই গুণ ও সততা যার ফলে যার যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

ন্যায়নীতি হলো রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। ন্যায়নীতি প্রত্যাহার করা হলে রাষ্ট্র ও এক বিরাট দস্যু দলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এ ভাবে স্বর্গরাজ্যের প্রশংসা করে তিনি সার্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অগাষ্টিন বিশ্বাস করতেন যে, গির্জার প্রতি আনুগত্য ও প্রেম স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীতে গ্রির্জাই হল স্বর্গরাজ্যের প্রতিনিধি। আর এ কারণে গির্জাকে মান্য করা উচিত। গির্জার মাধমে সমাজ পরিচালিত হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল সার্বজনীন খ্রিষ্টীয় সমাজ (Universal Christian Society) প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে গির্জা একটি বাস্তব ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান,যার মাধ্যমে মানুষ মুক্তির সন্ধান পেতে পারে। তিনি গির্জাকে সামাজিক মানুষের মহা মিলন স্থান বলেছেন। সমাজে গির্জার ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। এভাবে অগাষ্টিন রাষ্ট্রের উপর গির্জার প্রধান্য বিস্তারের কথা ব্যাখ্যা করেন। অগাষ্টিনের চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের উপরে আআত্মিক মুক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোন কিছুই আলোচনা করেন নি। মানুষের চরিত্র গঠন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ অধিক প্রয়োজন। তাঁর মতে ধর্মবর্জিত রাজনীতি মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অগাষ্টিনের মতে মানুষের ইতিহাস হল স্বর্গীয় ও পার্থিব শহরের সংগ্রামের ইতিহাস। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম ও অধর্মের বিরোধ চলে আসছে। সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভর প্রতীক হল স্বর্গীয় ও পার্থিব শহর। সমাজে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি থাকবেই। এবং এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের জয় হবে। স্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও অর্থের লিপ্সা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। মানুষ

ন্যায়নীতি ছাড়া আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়

সততা ও ন্যায়নীতিই মানুষের মুক্তি আনতে পারে

যখন আত্মার দ্বারা শাসিত হয় তখনই ন্যায় বিচার অর্জিত হয়। অগাষ্টিন ন্যায় বিচার তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

সারকথা ঃ

মধ্যযুগে গির্জা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিরোধের সন্ধিক্ষণে সেন্ট-অগাষ্টিনের চিন্তাধারা রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ ও যাজকদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। চিন্তাবিদ ক্রিষ্টোফার মরিস যথার্থই বলেছেন,"অগাষ্টিনের চিন্তাধারা মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছে।" রোমান সাম্রাজ্যের দুর্দিনে সেন্ট-অগাষ্টিন খ্রিষ্টধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন। সেন্ট অগাষ্টিন ছিলেন মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয়-চার্চের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সেন্ট অগাষ্টিন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাথমিক ধারণা কার কাছ থেকে লাভ করেন?
(ক) বাবার কাছ থেকে; (খ) মা'র কাছ থেকে;
(গ) গুরু এমব্রোসের কাছ থেকে; (ঘ) পোপের কাছ থেকে।

২। মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল কোন গ্রন্থটি?
(ক) *আল মোকদ্দিমা;* (খ) *দি রিপাবলিক;*
(গ) *দি সিটি অব গড।*

৩। মানুষের চরিত্র গঠন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ অধিক প্রয়োজন। এই বক্তব্যটি কার?
(ক) সেন্ট-এমব্রোসের; (খ) প্যাগানদের;
(গ) অষ্টিনের; (ঘ) সেন্ট অগাষ্টিনের।

৪। সেন্ট অগাষ্টিনের মতে ক্ষমতা, স্বার্থপরতা ও অর্থের লিপ্সা মানুষকে কোন পথে পরিচালিত করে?
(ক) সুপথে; (খ) বিপথে;
(গ) কল্যাণের দিকে; (ঘ) শান্তির দিকে।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সেন্ট-অগাষ্টিনের চিন্তাধারা আলোচনা করুন।

২। *সিটি অব গড* পুস্তকটির মূল বক্তব্য কি?

পাঠ-৩

টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ টমাস একুইনাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবেন;
- ❑ তাঁর আইনতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মধ্যযুগের চিন্তাবিদ টমাস একুইনাস সিসিলি ও ক্যাম্পনিয়া রাজ্যের উপশহর রককানিক্কা নামক স্থানে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে *Summa Theologica* অমর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদ এরিস্টটলের ধ্যান-ধারণার সাথে রোমের আইন ও খ্রিষ্টান ধর্মের সমন্বয় ঘটান। অল্প বয়স থেকেই তিনি দর্শন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি প্যারিসে গমন করে আলবার্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার জ্ঞানের গভীরতা ও উদারতার জন্যে তিনি সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মতবাদে মধ্যযুগের তিনটি মহান চিন্তাসূত্র প্রতিফলিত হয়েছে। (১) বিশ্বজনীনতা (২) পান্ডিত্যবাদ ও (৩) এরিস্টটলীয় দর্শন।

আইন তত্ত্ব (Theory of law)

আইন সম্পর্কিত তত্ত্ব ও চিন্তাধারায় টমাস একুইনাসের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ধারণার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে ইউরোপীয় চিন্তাধারার মাধ্যমে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। একুইনাসের মতে,আইন হল ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি ও নিয়ম। এই পদ্ধতি ও নিয়ম দ্বারা মানুষ কোন কাজ করতে প্রলুব্ধ হয় অথবা কোন কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।(Law is a rule or measures of acts, whereby man is induced to act or restrained from acting) তিনি বলেন যে, আইন হল যুক্তির প্রকাশ। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি আইনকে সামাজিক কল্যাণ বাস্তবায়িত করার একটি কার্যকর পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন।

আইন হল যুক্তির প্রকাশ

একুইনাস আইনকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ

- শাশ্বত আইন (Eternal Law);
- প্রাকৃতিক আইন (Natural law);
- ঐশ্বরিক আইন (Divine law);
- মানবিক আইন (Human law)।

শাশ্বত আইনঃ শাশ্বত আইন বা চিরন্তন আইনকে একুইনাস সর্বোচ্চ আইনের মর্যদা দিয়েছেন। চিরন্তন আইন হল সেই স্বর্গীয় যুক্তি যার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আইন সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং ক্রিয়াশীল। এ আইন দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর মতে এ আইনের নির্দেশ অন্যান্য আইনকে মেনে চলতে হবে। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাই শাশ্বত আইনের আকারে পার্থিব সমাজে প্রচলিত।

প্রাকৃতিক আইনঃ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। টমাস একুইনাসের মতে,"এটি শাশ্বত আইনের সেই অংশ যা যুক্তিবাদী প্রাণী মানুষ এবং অযুক্তিবাদী জড় বস্তুর জন্য আমাদের প্রতিপালক প্রকাশ করেন।" প্রতিটি জীব ও বস্তুর মধ্যে এ আইনের প্রতিফলন ঘটে। প্রাকৃতিক আইনের প্রভাবে মানুষ সন্তান জন্মদান এবং লালন পালন করে। এই আইনের তাড়নার মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়াসী হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সৎ ও ভালকে পেতে চায় এবং অন্যায় ও মন্দ কাজকে এড়িয়ে চলে। দয়া- মায়া,প্রেম-প্রীতি মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। বিধাতা মানুষকে যে স্বাভাবিক গুণাবলী দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে জীবনকে সুন্দর ও যথার্থভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। একুইনাসের মতে একমাত্র স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

ঐশ্বরিক আইনঃ ঐশ্বরিক আইন বলতে প্রধানত: বিধাতা কর্তৃক যেসব আদেশ-নিষেধ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে যেমন, বাইবেল, কুরআন প্রভৃতির মাধমে নির্দেশ করেছেন সেগুলোকে বুঝিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে প্রেরিত দূতের মাধ্যমে মানুষের জন্য করণীয় ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে এ আইন প্রদান করেছেন। এ আইন মানুষের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সাধারণত: এ আইনগুলো হচ্ছে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ। একুইনাস বলেন যে, ঐশ্বরিক আইনকে স্বাভাবিক আইনের বিরোধী বলে মনে করা অনুচিত। ঐশ্বী বাণীর মাধ্যমে মানুষ যে নির্দেশ লাভ করেছে তাই ঐশ্বরিক আইন। ঐশ্বরিক আইন দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ আদি বিধি (Old testament) ও নববিধি (New testament)। বিচার-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা হেতু মানুষে-মানুষে প্রায়ই বিরোধ দেখা দেয়। এর নিষ্পত্তির জন্য ঐশ্বরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

মানবিক আইনঃ মানবিক আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একুইনাস বলেন, সমাজ ও সম্প্রদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে ঘোষিত এবং যুক্তি থেকে উৎসারিত বিধান হল মানবিক আইন। মানবিক আইনগুলো হল সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির নির্দেশ। সমাজের নৈতিকতা ও সদাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানবিক আইনের গুরুত্ব কম নয়। এরিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনি প্রাকৃতিক আইন ও তার বাস্তবায়নের জন্য মানবীয় আইনের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। কেবল পাপীকে শাস্তি প্রদান নয়, ঐশ্বরিক যুক্তিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যও মানিবক আইনের প্রয়োজন।

মানবিক আইনগুলো হল সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির নির্দেশ।

টমাস একুইনাস মানবিক আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমনঃ

- মানবিক আইনের বিষয়বস্তু হবে শুধুমাত্র জাগতিক ও মানবিক;
- কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানবিক আইন প্রণীত হবে না;
- মানবিক আইন বৈধ ও সঠিক উৎস হতে উদ্ভুত হবে;
- মানবিক আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতার জন্য যুক্তির শাসন অপরিহার্য;
- অভিন্ন কল্যাণের (Common good) সাথে মানবিক আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

আইন সম্পর্কে টমাস একুইনাসের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর আইন তত্ত্বে যুগের প্রভাব রয়েছে। শাসকের ক্ষমতা অবশ্যই আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।তাঁর মতে শাসকের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। তিনি স্বেচ্ছাচারী সরকারের পরিবর্তে বৈধ সরকার (Lawful government) সমর্থন করেছেন।

আইনতত্ত্ব আলোচনায় টমাস একুইনাস বলেন যে, মানুষের জীবনে দুটি সত্তা বিদ্যমান- একটি পার্থিব অন্যটি আধ্যাত্মিক। মানুষের পার্থিব লক্ষ্য অর্জিত হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে। কিন্তু আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় তত্ত্বের বিষয়। তাঁর আইনতত্ত্বে যুক্তি ও বিশ্বাসের

সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয়দর্শন ও ধর্মীয়নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। স্যাবাইন বলেন একুইনাসের উদ্দেশ্য ছিল মানবীয় আইন ও দৈবিক আইনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলকে অনুসরণ করে টমাস একুইনাস বলেন যে, রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক সংস্থা এবং এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধণের জন্যই। একুইনাস এরিস্টটলের সংঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের অস্তিত্ব রাষ্ট্র ও সরকারকে অপরিহার্য করে তুলেছে। রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সংস্থা। তিনি উল্লেখ করেন যে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ কেবল রাষ্ট্রই মেটাতে পারে। কল্যাণকর সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রকে এমনভাবে সুসংহত করতে হবে যাতে পার্থিব সুখের উর্ধ্বে যে অপার্থিব শান্তি ও আনন্দ বিরাজমান তা যেন অর্থহীন না হয়ে পড়ে। এজন্য রাষ্ট্রের উচ্চতর সংগঠন তথা চার্চের প্রতি রাষ্ট্রের আনুগত্য থাকতে হবে। আত্মার মুক্তির জন্য খ্রিষ্টীয় চার্চ যাতে যথাযথ ভুমিকা পালন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধাণের জন্যই।

সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা এরিস্টটলের ধারণার অনুরূপ। তিনি রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ সরকার বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন সমগ্র বিশ্বে রয়েছে এক সৃষ্টিকর্তা, এক ঈশ্বর। দেহের বা শরীরের হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে এক অন্তকরণ। যেমন মৌমাছির রয়েছে এক রাজা। অনুরূপভাবে প্রতিটি স্বাভাবিক সরকার হল একজনের সরকার। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সরকার সামাজিক ঐক্য ও শান্তি বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। একজন শাসকই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম প্রতিভু। রাজতন্ত্র যাতে সেচ্ছাচারী না হয়, সে জন্য তিনি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চেয়ে নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। তিনি রাজতন্ত্রের ক্ষমতা সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এরিষ্টলের অনুকরণে একুইনাস দু'টি নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। প্রথমত: সকলের মঙ্গল,দ্বিতীয়ত,শুধু শাসকের মঙ্গল।

সরকার যখন সকলের মঙ্গলসাধন করার লক্ষ্যে শাসন করে তা কল্যাণকর ন্যায়পরায়ণ ও বৈধ শাসনা

সরকার যখন নিজেদের স্বার্থে শাসন করে তখন তা অকল্যাণকর, বিকৃত ও অবৈধ সরকার। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য তিনি জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কাজে সংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে সরকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় না তা অবৈধ ও পীড়নমূলক সরকার। সমাজের শান্তি ও ঐক্য বিনষ্ট হলে কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

সারকথা

টমাস একুইনাস প্রাচীন গ্রীক রাস্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটলের ধ্যান ধারণার মধ্যে রোমের আইন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন। আইন সম্পর্কিত তত্ত্ব ও চিন্তাধারায় তাঁর মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তিবোধের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। টমাস একুইনাস কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১২৭৪ সালে; (খ) ১২২৫ সালে;
(গ) ১২৩০ সালে; (ঘ) ১২২০ সালে।

২। টমাস একুইনাস জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কাজে কেন অংশ গ্রহণ করতে বলেছেন?

(ক) সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য; (খ) জনকল্যাণের জন্য;
(গ) শোষণ বন্ধ করার জন্য; (ঘ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য।

৩। নাগরিকের নৈতিক উন্নতির জন্য একুইনাস কিভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের কথা বলেছেন?

(ক) ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী; (খ) বিবেক অনুসারে;
(গ) বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী; (ঘ) আইন অনুযায়ী।

৪। একুইনাসের মতে সৃষ্ট জীব-জন্তু ও বস্তুর মধ্যে কোন আইনের প্রতিফল ঘটে?

(ক) ঐশ্বরিক আইনের; (খ) মানবিক আইনের;
(গ) প্রাকৃতিক আইনের; (ঘ) রাষ্ট্রীয় আইনের।

সঠিক উত্তর মালা ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪ ।গ

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে টমাস একুইনাসের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২। আইনতত্ত্ব সম্পর্কে একুইনাসের চিন্তা আলোচনা করুন।

৩। টমাস একুইনাসের রাষ্ট্রচিন্তা ব্যাখ্যা করুন। তাঁকে কি মধ্যযুগের এ্যারিষ্টটল বলা যায়?

পাঠ-৪

মারসিলিও পাদুয়া (১২৭০-১৩৪৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

- ❑ মারসিলিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ মারসিলিও রাস্ট্রদর্শনে এরিষ্টটলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্র ও শাসক সম্পর্কে মারসিলিওর অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মারসিলিও পাদুয়া মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট লেখক ও পোপতন্ত্র বিরোধী রাষ্ট্র চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির অন্তর্গত পাদুয়া নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন গুণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন একাধারে আইনবিদ, শিক্ষক, যাজক, চিকিৎসক ও রাজনীতিক। প্রফেসর মারে (Murray) মারসিলিওকে চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ট চিন্তাবিদ বলে উল্লেখ করেন। পাদুয়ার অনবদ্য রচনায় নাম *'ডিফেনসর প্যাসিস' (Defensor Pacis)* যার শাব্দিক অর্থ শান্তির রক্ষক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ ডিগ্রী লাভ করে প্রথমে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। ১৩১২ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মনোনীত হন। তাঁর শেষ দিনগুলো অতিবাহিত হয় জার্মান সম্রাট ব্যাভারিয়ার লিউইসের রাজ দরবারে। ১৩৪৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মারসিলিও-এর রাষ্ট্রদর্শন: এরিস্টটলের প্রভাব

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মারসিলিও পাদুর্য়া তাঁর রাষ্টতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর *'ডিফেনসর প্যাসিস'* গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সরকারের ধারণা, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাষ্ট্র -গির্জার সম্পর্ক ও আইনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের রাষ্ট্রতত্ত্বের শুধু বিকাশই নয় বরং সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে *ডিফেনসর প্যাসিস* একটি যুগান্তকারী রচনা।

মারসিলিওর বন্ধু ফরাসী পন্ডিত জান্দুনের (Jandun) সহযোগীয়তায় ১৩২৪ সালে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ম্যাক ইলওয়েনের মতে এয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *'ডিফেনসর প্যাসিস'* একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে তিনি রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খন্ডে গির্জার উৎপত্তি, বিকাশ ও সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে আগের দু'খন্ডের বিষয় বস্তু আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা ও আলোচনা করেছেন তাদের সকলেই মারসিলিওর সমুন্নত দৃষ্টিভংগীর প্রশংসা করেছেন। মধ্য যুগে জনগণের হাতে ক্ষমতা দেয়ার কথা বলে তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

এরিস্টটলকে অবলম্বন করে তিনি ধর্মকে দর্শন থেকে যুক্তিকে বিশ্বাস থেকে এবং গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেন

চিন্তাবিদ এরিস্টটল বিপ্লব সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন মারসিলিও সেগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এরিস্টটল যেভাবে প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে কোন কিছুর সত্যতা বা যথার্থতা বিচার করতেন, মারসিলিও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রকৃতিবাদ ও যুক্তিবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরিস্টটলকে অবলম্বন করে তিনি ধর্মকে দর্শন থেকে যুক্তিকে বিশ্বাস থেকে এবং গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেন। তিনি

আরও উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র স্বাধীন ও স্বার্বভৌম। তাই বলা যায় মারসিলিওর রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কিত ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের ধারণার অনুরূপ।

রাষ্ট্রঃ

মারসিলিও রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাবার জন্য রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, সমাজবদ্ধতা মানব চরিত্রের মহৎ গুণ। সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সহযোগীতাই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। তিনি উল্লেখ করেন যে, কৃষক-শ্রমিক, সৈনিক, বনিক, সরকারী কর্মচারী,পুরোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত এবং এদের সুসংহত প্রচেষ্টার ফলে রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করলে রাষ্ট্র সুস্থ্য ও সবল হয়ে উঠে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দায়িত্ব অবহেলা করলে কিংবা অন্যের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করলে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। রাষ্ট্রের সুস্থ্য ও শন্তিপূর্ণ অবস্থাকে মারসিলিও Tranquillys হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যদি সমক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিরাজ করে এবং একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাহলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হয়।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে- জনসাধারণ যাতে উত্তম জীবন যাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান

মারসিলিওর রাষ্ট্রতত্ত্ব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ব্যাপারে যাজকদের যে কোন রকমের বল প্রয়োগের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। জাগতিক সকল ব্যাপারে তিনি গির্জাকে রাষ্ট্রের অধস্তন বিভাগে পরিণত করার কথা জোরালো ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি পোপের বিশেষ প্রাধান্যের দাবিকে অস্বীকার করে বলেন যে, পোপ অন্যান্য যাজক বা বিশপদের মতই একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং তাঁদের সবার মর্যাদা সমান। তাঁর এই বক্তব্য গীর্জার প্রচলিত স্বার্বভৌম ক্ষমতাতত্ত্বের মূলে আঘাত হানে। তিনি ইতালী তথা সমগ্র ইউরোপের দ্বন্দ্ব- সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেন যে, এর মূলে রয়েছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পোপের প্রাধান্য। মারসিলিও এই প্রাধান্যের অবসানের দাবি তুলে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে প্রমাণ করেন।

মারসিলিও রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা (১) **প্রতিরোধমূলক** ও (২) **সহযোগিতামূলক**। এই বিবিধ কর্মকান্ড মানুষের চরিত্র থেকে উৎসারিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিরোধমূলক কার্য রাষ্ট্রের কর্মকান্ডকে প্রতিহত করে এবং সহযোগিতামূলক কার্য রাষ্ট্রের কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করে। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মানুষের মধ্যে একদিকে স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে যুক্তিবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব। পরবর্তীতে দার্শনিক হব্‌স্ এক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রবণতা থেকে সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুন্দর সমাজের জন্য সরকারের প্রাথমিক কাজ হল মানুষের অসামাজিক প্রবণতাগুলো দমন করা। সরকারের দ্বিতীয় কাজ হল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শান্তির অর্থ হল নিরাপত্তা বোধ। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করে।

শান্তির অর্থ হল নিরাপত্তা বোধ

মারসিলিও সরকারের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি। তাঁর আইন ও আইন প্রণেতা তত্ত্ব থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি গণতন্ত্রের চেয়ে রাজতন্ত্রকে শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তিনি যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল এই যে, রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক না হয়ে নির্বাচিত হবে। রাজতন্ত্র নির্বাচিত পর্যায়ের হলেই জনগণের সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। তাঁর এই ধারণায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব

আইন সম্পর্কে মারসিলিওর ধারণা তাঁকে এরিস্টটল ও মধ্যযুগ থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। মধ্যযুগের চিন্তাবিদ ও লেখকগণ আইনকে সাধারণের কল্যাণ ও যুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতেন। তিনি এই প্রথার অবসান ঘটান। আইনকে তিনি সরকার সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য যা কল্যাণকর ও ন্যায়সংগত তার যথাযথ উপলব্ধি হলো আইন।' আইন হলো ন্যায় নীতির বিধান। তাঁর মতে আইন হল এমন সব বিধি বিধানের সমষ্টি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবোধপ্রসূত, যা সার্বজনিন ও স্বীকৃত কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযোজ্য এবং যার পিছনে রয়েছে ক্ষমতার সমর্থন। তিনি আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা আধুনিকতার আলোকে সমুজ্জ্বল। মার্সিলিওর আইন প্রণেতার ধারণা তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে।

আইন হলো ন্যায় নীতির বিধান

মারসিলিও আইনকে মূলত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা: ঐশ্বরিক আইন ও মানবিক আইন। ঐশ্বরিক আইন হল ঈশ্বরের নির্দেশ। কিন্তু মানবিক আইন মানুষের তৈরী। তিনি ঐশ্বরিক আইন ও মানবিক আইনের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, ''ঐশ্বরিক আইন মানুষের ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পর্কে মানুষের কোন ধ্যান ধারণা ছাড়াই সরাসরি বিধাতার কাছ থেকে আগত এমন এক আদেশ যা কেবল মানুষের পরলৌকিক জীবনের উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিংবা মানুষের জন্য বাঞ্চনীয় কতিপয় শর্ত সুনিশ্চিত করার জন্য ইহলোকে পালন বা বর্জন করা হয়।" মানবিক আইন মানুষের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি আগত সকল নাগরিকের কিংবা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটি বিধান। এটি ইহকালের উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা মানুষের জন্য কাঙ্খিত কতিপয় শর্ত নিশ্চিত করার জন্য শুধু ইহজগতেই পালিত বা বর্জিত হয়।

মানবিক আইনের উৎস হচ্ছে জনগণের সমষ্টিগত কার্যক্রম

ঐশ্বরিক ও মানবিক আইন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিধান। ঐশ্বরিক আইনের উৎস স্বয়ং বিধাতা এবং তাতে মানুষের তেমন কিছু করণীয় নেই। অন্যদিকে মানবিক আইনের উৎস হল মানুষ নিজে। এখানে ধর্মের কিছু করণীয় নেই। মারসিলিও আইনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে তিনি যুক্তি বা ন্যায় বিচার অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনকে সফলভাবে কার্যকর করতে হলে আইন হতে হবে সার্বজনীন ইচ্ছার প্রকাশরূপ। এক্ষেত্রে তিনি আইন প্রণেতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মারসিলিও সমগ্র জনগণকে কিংবা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আইন প্রণেতা বলে অভিহিত করেছেন। আইন প্রণেতার সামনে তিনি একজন ব্যক্তিকে বসিয়ে দিতে চাননি। তাঁর আইন প্রণেতাতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি রাজাকে জনগণের প্রভুর আসন থেকে নামিয়ে তাদের সেবকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন যে, আইনের প্রধান উৎস হল আইন প্রণয়ণকারী নিজে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

সারকথা :

মারসিলিও মধ্যযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মারসিলিও তার 'ডিফেনসর প্যাসিস' গ্রন্থে সরকারের ধারণা, রাষ্ট্র ও গির্জার সম্পর্ক, আইনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আইন সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মারসিলিও কোন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ?
(ক) এয়োদশ শতাব্দী; (খ) চর্তুদশ শতাব্দী;
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দী; (ঘ) ষোড়শ শতাব্দী।

২। *ডিফেনসর প্যাসিস* গ্রন্থটি কত সালে রচিত হয়েছিল?
(ক) ১২৭৪; (খ) ১৩১২;
(গ) ১৩২৪; (ঘ) ১৩৪৩।

৩। মারিসিলিও কোন গ্রন্থটিকে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন?
(ক) *ডিফেনসর প্যাসিস;* (খ) *ডিফেনসর মাইনর;*
(গ) *দি রিপাবলিক;* (ঘ) *পলিটিকস্।*

৪। মারসিলিও আইনকে ক'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন?
(ক) ২ টি ; (খ) ৩ টি;
(গ) ৪ টি; (ঘ) ৬ টি।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে মারসিলিওর অভিমত ব্যাখ্যা করুন।
২। মারসিলিওর আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব আলোচনা করুন।